ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™ SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ।। ২৫ মাঘ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

জীবিকার স্বার্থে যে কোনও রাজ্যে যাওয়া যাবে : ভাগবত

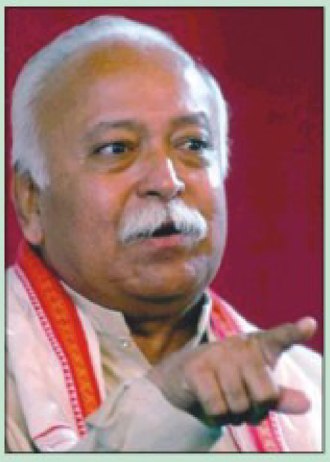

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সারা ভারতবর্ষই সকল ভারতবাসীর জন্য। সব ভারতবাসীই ভারতের যে কোনও স্থানে জীবিকা অর্জনের জন্য যেতে পারে। মুম্বাই সকল ভারতবাসীর জন্যই। গত ৩০ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে এক স্বয়ংসেবক সমাবেশে সরসঙ্ঘচালক হিসেবে প্রথম সফরে এসে একথা বলেন মোহনরাও ভাগবত। তিনি বলেন, ভাষা, জাতি, উপজাতি, বর্ণ নানারকম হতে পারে, কিন্তু আমরা সবাই ভারতমাতার সন্তান। অন্যান্য প্রদেশ থেকে আসা লোকেদের জন্য স্থানীয় মানুষদের (মহারাষ্ট্র) কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাচ্ছে—এই ধারণা ভুল। এই অভিযোগ বা ক্ষোভের সমাধান অন্যভাবে খুঁজতে হবে। এজন্য অন্য প্রদেশের মানুষকে তাড়িয়ে দেওয়া কোনও সমাধান নয়।

ঘটনা হলো, আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক শ্রীভাগবতের এই বিবৃতি নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল ও সংবাদ-মাধ্যমের একাংশ জলঘোলা করতে নেমে পড়েছে। শিবসেনা ও বিজেপির জোটের ফাটল ধরাতেই তাদের এই প্রয়াস। এতে অবশ্য সঙ্ঘের বক্তব্যের কোনও রকম হেরফের হবে না। সঙ্ঘ বরাবরই বলে এসেছে—কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ভারত একরাষ্ট্র।

এই সফরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীভাগবত বলেছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের মধ্যে এই অনুভব ক্রমশ বাড়ছে যে ধর্মান্তরকরণের অর্থ হলো নিজেদের পরিচয় ও সংস্কৃতিকে হারানো। শুধু তাই নয়, যারা ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাদের মধ্যেও নিজেদের মূল ধর্মে ফিরে আসার তাগিদ বাড়ছে। শ্রীভাগবত বলেন, উপজাতিদের নিজস্ব বিশ্বাস ও পরম্পরাকে রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বরাবরই কাজ করে আসছে।

মেধা যাচাই না করেই তিন লক্ষ মুসলিমকে ছাত্রবৃত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মেধার যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই। স্রেফ মুসলিম হলেই হলো। জাতীয় মেধাবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আড়াআড়ি বিভাজন করায় সর্বস্তরে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কোনও মুসলমান ছাত্র বৃত্তি চেয়ে আবেদন করলেই তাকে মেধাবৃত্তি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ মেধার মান যাচাই হচ্ছে না। ফলে একজন মুসলমান ছাত্র ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত বার্ষিক বৃত্তি পেয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতি আর্থিক বছরে প্রায় তিন লক্ষ মুসলমান ছাত্রছাত্রী মেধাবৃত্তি পেয়েছে। যারা আবেদন করেছিল তাদের প্রত্যেককেই বৃত্তির টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্কুল শিক্ষা দপ্তরের খবর, রাজ্যে তিন হাজার হিন্দু ছেলেমেয়েও বৃত্তি পায়নি। কারণ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেধা তালিকার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া তালিকা মেনেই বৃত্তি দেওয়া হয়। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতী ছাত্রদের যে তালিকা তৈরি হয় তাতে মেধাবী মুসলমান ছাত্রছাত্রীরাও থাকে। তারা আবার মুসলমান হিসেবে পৃথকভাবে মেধাবৃত্তি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে। এভাবে আবেদনকারী সমস্ত মুসলিম ছাত্রছাত্রীকেই মেরিট স্কলারশিপ দেওয়া নিয়ে প্রশাসনিক মহলেও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। বহু আমলার মধ্যে এইভাবে সংখ্যালঘু তোষণের ব্যাপক প্রতিক্রিয়াও হচ্ছে। মেধাবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক সামঞ্জস্য নিয়েও পৃথক মাপদণ্ড তৈরি হওয়ায় ক্ষোভের মাত্রা বেড়েছে। মুসলিম পরিবারের বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা রোজগার হলেও তারা মেধাবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য। অথচ সাধারণ হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকার বেশি হলে আর মেধাবৃত্তি পাওয়া যায় না। স্রেফ মেধা সার্টিফিকেট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে যে কোনও মূল্যে মুসলিমদের মেধাবৃত্তির টাকা পাইয়ে দিতেই কি বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা আয়ের সংস্থান করতে বলা হয়েছে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের কর্তাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম মেনেই মেধা বৃত্তির টাকা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে রাজ্যের কিছুই করার নেই। এরাজ্যে ২৭ শতাংশ মুসলিম। ফলে আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেশি হবে। স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য আরও নাম চেয়েছে দিল্লি। সেইমতো নাম পাঠানো হচ্ছে। আসলে মুসলিম ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের তোষণ নীতি রীতিমতো প্রতিযোগিতার স্থানে চলে গিয়েছে। তাতে সাধারণ হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয় সরকার। কিন্তু প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ে মুসলিম সরকারি কর্মীর দ্বিতীয় বিয়ে বেআইনী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মুসলমান সরকারি কর্মচারীদের দ্বিতীয় বিয়েকে বেআইনী বলে রায় দিল ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট। রাজস্থান পুলিশের কনস্টেবল জনৈক লিয়াকত আলির পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের দু'জন বিচারপতি—শ্রী ভি এস শিরপুরকর এবং বিচারপতি আফতাব আলম-এর ডিভিসন বেঞ্চ গত ২৫ জানুয়ারি ওই রায় দিয়েছেন। এর আগে রাজস্থান হাইকোর্টে লিয়াকত আলির দ্বিতীয় বিয়ের মামলা ওঠে। রাজস্থান হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লিয়াকত সুপ্রীম কোর্টে গিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে যুক্তি ছিল—রাজস্থান সিভিল সার্ভিস রুল- ১৯৭১ অনুসারে যে কোনও ধর্মের সরকারি চাকরিজীবী সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারেন।

রাজ্য সরকার (রাজস্থান) ২৩ বছর আগে লিয়াকত আলিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিল। সরকারি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে এবং প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না করেই আলি দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। মুসলিম পার্সোন্যাল ল'কে খাড়া করে আলি ১৯৮৬ থেকে বিভিন্ন কোর্টে মামলা চালিয়েছে। আলি আদালতকে জানিয়েছিলেন, তিনি দ্বিতীয় বিয়ের আগে প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স করেছেন। তখন নিম্ন আদালতের নির্দেশে তদন্ত হয়। তদন্তে প্রমাণিত হয় আলি প্রথম স্ত্রী ফরিদা খাতুনকে ডিভোর্স না দিয়েই মকসুদা খাতুনকে বিয়ে করেছেন।

(এরপর ৪ পাতায়)

বীর সেনাপতি চিলারায় (প্রতিবেদন ভেতরে)।

সাঁইবাড়ী চাপা দিতে আসরে সি পি এম

গূঢ়পুরুষ।। সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের বেআইনিভাবে জেল থেকে মুক্ত করে উচ্চ সরকারি পদে বসিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে আড়াল করতে সিপিএমের তল্পিবাহকরা এখন আসরে নেমেছে। তারা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখছেন যে বর্ধমানের সাঁইবাড়ি মামলা সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বাস্তবে এই হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের প্যারোলে নয়, ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২১ ধারায় রাজ্য সরকার মামলা প্রত্যাহার করায় তারা বেকসুর খালাস হয়েছে। চমৎকার কথা। মিথ্যা প্রচারে মানুষকে বিভ্রান্ত করাতে যে সিপিএম পার্টির জুড়ি নেই তা আবার প্রমাণিত হলো।

সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের শাস্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় অনেকের সঙ্গেই সিপিএমের নিরুপম সেন, বিনয় কোঙার, অমল হালদার, অনিল বসু-র মতো প্রথম সারির নেতারা ছিলেন। এদের সকলেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেই বামফ্রন্টের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশে খুনি আসামীদের জেল থেকে বেআইনিভাবে বার করে আনা হয়। আলিমুদ্দিনে পার্টির নেতৃত্ব এবং মহাকরণে পার্টির সরকার জানে যে কাজটা বেআইনি ছিল। তাই বিষয়টি নিয়ে এত বছর পর লেখালেখি হলেও পার্টি বা সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি কোনও বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে না। তার বদলে পার্টির প্রসাদপুষ্ট কিছু কলমচিকে আসরে নামানো হয়েছে অসত্য তথ্য দিয়ে সত্যকে আড়াল করতে।

বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে সাঁইবাড়ি মামলাকে আলোয় ফিরিয়ে এনেছেন সুপ্রিম কোর্টের বাঙালি আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর আবেদনে জানিয়েছেন যে কীভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২১ ধারার অপব্যবহার করে খুনি অপরাধীদের প্রথম বামফ্রন্ট সরকার জেল থেকে মুক্ত করেছিল। জয়দীপবাবুর আবেদন খতিয়ে দেখার পরেই মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সাঁইবাড়ি মামলার সমস্ত নথিপত্র কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারকে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। জয়দীপবাবুর আবেদনে যদি কোনও 'মেরিট' না থাকতো তবে নিশ্চিতভাবেই সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা এমন নির্দেশ দিতেন না।

আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা

বিষয়টি নিয়ে আগেই স্বস্তিকায় বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি না করে শুধু সিপিএমের তল্পিবাহকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ৩২১ ধারায় খুনের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের বেকসুর খালাস করা যায় না। বিচারাধীন অন্য মামলার কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে আদালতের সম্মতিতে এই ধারায় মামলা প্রত্যাহার করা যায়। সাজা ঘোষণার পরে কোনওভাবেই ৩২১ ধারায় মামলা প্রত্যাহার করা যায় না। অথচ সব জেনেও এই ধারার অবৈধ প্রয়োগে সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের জেল থেকে বার করে আনা হয়। যে সব পাবলিক প্রসিকিউটাররা ও মহাকরণের আমলারা সেই সময় এই বেআইনি কাজে লিপ্ত ছিল এবং বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছিল তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া উচিৎ।

সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের সমসাময়িক একটি খুনের মামলায় উত্তরপ্রদেশের এটোয়াতে অনেকটা এইভাবেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা মামলা ৩২১ ধারায় প্রত্যাহারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭৫ সালের ৫ ডিসেম্বর এক

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life INSURANCE
With Us, Your's Sure

বিজেপিতে প্রশিক্ষণ চালু হচ্ছে

নীতিন গড়করি

বিনয় সহস্রবুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিজেপি'তে সর্বভারতীয় স্তরে আর এস এস-এর মতোই প্রশিক্ষণ-শিবিরের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে বলে খবর। ২০১৪-এর সংসদীয় নির্বাচনের আগে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। যদিও দলীয় সূত্রে প্রশিক্ষণের চিন্তা-ভাবনা এখনও প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার স্তরে বলে বলা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের আদর্শগত পরিপক্কতা এবং কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি র জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ নির্দিষ্ট সময়াবধির প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের ব্যবস্থা সাংগঠনিক স্তরেই রয়েছে।

বর্তমান বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়করির ঘনিষ্ঠরা জানিয়েছেন, বিস্তারিত আলোচনা চলছে—সিদ্ধান্তগ্রহণ বাকী। ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রে ২০০৭-'০৯-এ বাছাই করা ১৭ জনের পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে। প্রশিক্ষণের ভার ছিল এবং রয়েছে মুম্বাই-এর প্রতিষ্ঠান—'রামভাও মহালগি প্রবোধিনী'। দীর্ঘদিন দক্ষতার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের নির্দেশকের কাজ চালাচ্ছেন বিনয় সহস্রবুদ্ধে। এখানেই শীর্ষস্তরের নেতাদের প্রশিক্ষণ, প্রবোধন হয়ে থাকে। সহস্রবুদ্ধে র বক্তব্য, সকলে একমত হলেই প্রশিক্ষণের বিষয়টাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হবে।

সম্প্রতি সহস্রবুদ্ধে বিজেপি সভাপতির রাজনৈতিক পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রী সহস্রবুদ্ধে আরও জানিয়েছেন যে, এই প্রশিক্ষণ দলের আদর্শগত পরিপক্কতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের রীতি-নীতি, সামাজিক বিষয় ও অন্যান্য ঘটনাবলী এবং সর্বোপরি জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। বিগত ছ'বছরে দু'বার বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মন্ত্রীদের প্রশিক্ষণ হয়েছে।

এবার পেশাদার ম্যানেজমেন্ট ও অন্যান্য প্রশিক্ষকদের দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ানো হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী। নীতিন-এর পূর্বসূরী রাজনাথ সিং-এর মতে দলীয় কর্মীদের আদর্শগত দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে হিন্দুত্ব বিষয়ে সঠিক ভাবনা-চিন্তা থাকাও জরুরী। তপশিলী জাতি, জনজাতি ও ওবিসি ভুক্তরা প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছে।

পরপর দুটো লোকসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত হওয়ার পর ভারতীয় জনতা পার্টি সবকিছু ভুলে সামনের দিকে এগোতে চাইছে।

এই সময়

প্রতীকি আঁধার

অকস্মাৎ আঁধার নেমেছিল ইডেন গার্ডেন্সে। রাজ্য সরকার দায় চাপিয়েছিল সিএবি-র ঘাড়ে। হম্বিতম্বি করেছিলেন কলকাতার নগরপাল গৌতমমোহন চক্রবর্তী। এবার আঁধার নামল কলকাতা বইমেলায়। এর জন্য রাজ্য সরকার দায় চাপাল বুকসেলার্স গিল্ডের ঘাড়ে। হম্বিতম্বি করলেন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন। রাজা-মন্ত্রীরা যতই 'হম্বিতম্বি' করুন না কেন, দুর্মুখেরা বলছেন, তাঁদের দিন ফুরিয়েছে আর তা বোঝাতেই নাকি এই প্রতীকি ব্যঞ্জনা।

বেগুন ভর্তা

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের দুনিয়ায় যে আর শুকনো কথায় চিঁড়ে ভিজবে না সেটা উপলব্ধি করেই এদেশের পরিবেশপ্রেমীরা লড়াই-এ নামলেন বিটি বেগুনের বিরুদ্ধে। আর এই লড়াই-এ তাদের হাতিয়ার বেগুন ভর্তার মতো লোভনীয় একটি রান্না। গ্রীন-পিস ইন্ডিয়া নামক একটি বেসরকারী সংস্থা পরিকল্পনা করেছে যে রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত এবং সাধারণভাবে উৎপাদিত বেগুন মিলিয়ে-মিশিয়ে একটি জম্পেশ বেগুন-ভর্তা রান্না করা হবে। যদিও এর দাম এখনই নির্ধারিত হচ্ছে না। সংস্থাটির দাবী যে এই রান্নার পদটি হবে "পৃথিবীর বৃহত্তম বেগুন ভর্তা।"

হৃদয়-বিদারক

অবস্থাটা ভাবুন একেবারে! গত ৩১ জানুয়ারি হায়দরাবাদে 'বিটি বেগুন' নিয়ে জনশুনানিতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে একপ্রকার জনরোষের মুখে পড়েন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জয়রাম রমেশ। তাঁকে বেগুনের মালা 'উপহার' দেন স্থানীয় কৃষকরা। অন্যদিকে ওইদিনই বাইপাস সার্জারির পর এইমস-এ হার্টের রুটিন চেকআপ করাতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং। ডাক্তাররা বললেন, তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র নাকি ঠিকই আছে। ডাক্তারদের যে কে বোঝাবে, বিটি বেগুনকে শিখণ্ডী খাড়া করে দেশকে মার্কিন হস্তে সমর্পণের এমন চক্রান্ত যখন জনরোষের মুখে পড়ে তখন কি আর চক্রান্তকারী মনমোহনের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে থাকতে পারে!

সাঁচী সম

বৌদ্ধ ধর্মের অপরূপতার সহস্রাধিক বছরের সাক্ষী মধ্যপ্রদেশের সাঁচী স্তূপ। এবারে বোধহয় তাতে ভাগ বসাতে চলেছে মধ্যপ্রদেশেরই উজ্জয়িনীর কাছে সম্প্রতি আবিষ্কৃত সাঁচীর মতোই অবিকল একটি স্তূপ। উন্দাসায় অবস্থিত এই স্তূপটির নাম বৈশ্য তিরকি। ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করছেন এটি খৃষ্ট-পূর্বাব্দ তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হবে ভবিষ্যতে।

পশুরাজের রাজ্য

পশুরাজ সিংহের শাসনাধীন রাজ্যের সীমানা নিয়ে গোল বেঁধেছে গুজরাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প অনুযায়ী গুজরাতের গির অরণ্যের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এশিয়াটিক প্রজাতির সিংহদের স্থানান্তরিত করে মধ্যপ্রদেশের কুনো-পালপুরে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন ট্রাস্ট নামক একটি সংস্থার পক্ষ থেকে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পি আই এল দাখিল করা হয়েছে। তাই পশুরাজের রাজত্বের ভাগ্য নির্ধারণে ভরসা আপাতত সুপ্রিম কোর্ট-ই।

নারীশক্তি

নারী-শক্তি জাগ্রত মধ্যপ্রদেশে। আরও সুখের কথা, এই শক্তি প্রতিফলিত হয়েছে ক্ষমতায়নের বৃত্তে অর্থাৎ নির্বাচনে। ওই রাজ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যা রয়েছেন। পঞ্চায়েত প্রধানের সংখ্যা ১১ হাজার ৫২০ জন। পার্ষদ সদস্যা রয়েছেন ৩৪০০ জন। জেলা পরিষদের সদস্যা আছেন ৪১৫ জন মহিলা। ২৫টি জেলা পঞ্চায়েতও ১৫৬টি পুরসভার প্রধানের পদেও রয়েছেন মেয়েরা। মহিলা কাউন্সিলারের সংখ্যাটা হলো ১৭৮০। নগর পঞ্চায়েতের সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করছেন ৯৫ জন মহিলা। পুর-প্রধানের পদে মহিলা সভানেত্রী রয়েছেন ৩২ জন। ৮টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে মহিলারাই মেয়র হয়েছেন।

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ

মাতৃভাষা রক্ষার অভিনব অঙ্গীকার। ৩০ জানুয়ারি জুনাগড়ের সৌরাষ্ট্র শহর থেকে শুরু হয়েছে একটি যাত্রা, যার পোশাকী নাম মাতৃভাষা বন্দনা যাত্রা। প্রাদেশিক সংকীর্ণমনা দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সম্পূর্ণ উদারমনা এই যাত্রার উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষ যাতে তাদের মাতৃভাষাকে যথাযথভাবে শেখে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। এই যাত্রাটি যাঁর মস্তিষ্ক-প্রসূত তিনি হলেন মিশিগান ও আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক গুণবন্ত শাহ। অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে জৈনক ছাত্র তার মাতৃভাষা তেলেগু বলার 'অপরাধে' শাস্তিভোগ করছে—এই করুণ দৃশ্য দেখার পরই এধরনের অভিনব যাত্রার কথা মাথায় আসে শ্রী শাহ-র।

স্ত্রী-বুদ্ধি

স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ংকরী না হলেও একটু যে বোকা বোকা টাইপের, বরং বলা ভাল একটু ভাবুক প্রকৃতির এবিষয়ে নিঃসন্দিহান ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। দ্য সানডে টাইমস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানকার গবেষকমহলের বক্তব্য যে, কোনও জোকস-এর হাস্যরস উপলব্ধি করতে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা কিঞ্চিৎ অধিক সময় নেন। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন, আসলে মহিলারা জোকসের বিষয়বস্তুগুলোকে বুঝতে পুরুষদের তুলনায় মস্তিষ্কের অনেক বেশি অংশ ব্যবহার করেন। সেই কারণে তা বুঝতে যেমন বেশি সময় লাগে তেমনি হাসির পরিমাণও কিছুটা কমে আসে। জোকসের রিয়্যালিটি শো'-এর মহিলা বিচারকরা না এবার নারীবাদী সমিতিতে যোগদান করে বসেন!

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি

একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি র কারণে সাধারণ মানুষ যখন বিপর্যস্ত, তখন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার বলিতেছেন, তিনি জ্যোতিষী নন যে কবে এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আসিবে তাহা বলিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই মূল্যবৃদ্ধি র দায় রাজ্য সরকারগুলির উপর চাপাইয়া দায়িত্বও এড়াইতে চাহিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্বয়ং এই ধরনের কথা বলিতেছেন। রোজ দুইবেলা আহারের জন্য সব্জী হইতে শুরু করিয়া চাল, ডাল, গম ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম এতটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহা মধ্যবিত্ত জনতার ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষই ড্রাইভার, পিয়ন, পরিচারক এবং এরকম অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করিয়া থাকে যাহাদের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকারও কম। এমনকী ইহাদের অপেক্ষা যাহারা আরও একটু স্বচ্ছল, তাহারাও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক কেজি চিনির দাম ৫০ টাকা, এক লিটার দুধ ২৬ টাকা, শাক-সব্জীর কিলো ৩৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে, সরষের তেল প্রায় ১০০ টাকা কেজি এবং ‘গরীবের মিষ্টি’ গুড় এখন ৪০ টাকা কেজি। বাজারে জিনিসপত্রের অভাবের জন্য যে এই দাম বৃদ্ধি এমন নয়। জিনিসপত্রের অভাব নাই, কিন্তু মানুষের কাছে তাহা কিনিবার মতো টাকা নাই। এই অবস্থাকে ‘হাইকস্ট সোসাইটি’র লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। নিম্ন আয়ের সমাজ হওয়া সত্ত্বেও দিনদিন উচ্চ ব্যয়সম্পন্ন সমাজের দিকে রূপান্তরিত হইতেছে।

রাজনৈতিক নেতারা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার পরিবর্তে পরস্পরকে দোষারোপ করিতেই ব্যস্ত। বলা হইতেছে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের প্রস্তাব মানিয়া লইলে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম তিন টাকা বাড়িয়া যাইবে। একথা সকলেরই জানা যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরাই পেট্রোলের ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুই চাকার বাহন তো এখন সাধারণ মানুষের কাছেও রহিয়াছে। খোদ সরকার নিজের মন্ত্রীদের ঘাড়েই এইজন্য দোষ চাপাইতেছে। আমাদের রাজনীতির ইহা একটা স্থায়ী বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে যখনই নির্বাচন পর্ব মিটিয়া যায়, তখনই দাম বাড়িতে থাকে। দাম বৃদ্ধি র সহিত নির্বাচনের একটা সরাসরি সম্পর্ক রহিয়াছে। দ্বিতীয় যে কারণ তাহা হইল প্রবল ভোগবাদ। উচ্চ ব্যয়সম্পন্ন সমাজের যাহা একটি মুখ্য উপাদান। বিজ্ঞাপনের প্রচারে ও চাকচিক্যময় মোড়কের ভোগ্যসামগ্রী স্থানীয় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে এবং পরিণাম মূল্যবৃদ্ধি র কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী আমদানীকৃত অপরিশোধিত চিনি শোধন করিয়া বিক্রির ব্যাপারে উত্তরপ্রদেশের চিনিকলগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন। এই কারণে চিনির দাম প্রায় আকাশছোঁওয়া হইয়া উঠিয়াছে। মহারাষ্ট্রকে ছাড়িয়া দিলে একমাত্র উত্তরপ্রদেশে চিনিকলগুলির সংখ্যা সর্বাধিক। মায়াবতী সরকার গমের অধিক মূল্যলাভের জন্য আমদানীকৃত চিনির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে। খবর হইল, দেশে নয় লক্ষ টন চিনি আমদানি হওয়ার কথা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি লইয়া যদি কেন্দ্র ও রাজ্য পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে থাকে, তাহা হইলে আর যাহাই হউক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দূরদর্শী ভাবনা-চিন্তার অভাব রহিয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের দেশের উর্বর ভূমি থাকা সত্ত্বেও চিনির মতো সামগ্রী আমদানী করিতে হইতেছে। কৃষিমন্ত্রী জ্যোতিষী না হইতে পারেন, তিনি দ্রব্যমূল্য রোধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা তো বলিতে পারিতেন। মনে হইতেছে, মূল্যবৃদ্ধি রোধে আমাদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির নির্দিষ্ট কোনও নীতি নাই। আমরা অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি সমবেতভাবে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে দেশের প্রায় তেত্রিশ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে রহিয়াছে। যাহারা দিন আনিয়া দিন গুজরান করে। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের ফলে তাহাদের কী অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ভগবান অর্জুনকে বলছেন—তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করাবার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার করব। ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুশী; থেকে থেকে বিকট চিৎকার—আমি প্রভুর শরণাগত আমার আবার ভয় কি? আমায় কি আর কিছু করতে হবে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ওই কথাগুলো খুব বিট্‌কেল আওয়াজে বারম্বার বলতে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার ওপর মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত স্বরে জানানও আছে যে, তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত! এ ভক্তির জোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দু-চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়তে প্রস্তুত নন। বলি ঠাকুরজী কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলি নি!!

—ভাববার কথা, স্বামী বিবেকানন্দ

জ্যোতি বসু হল্ল ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংসদীয় ক্ষমতার অলিন্দে আবদ্ধ করার রূপকার

এন. সি. দে

আজকে যারা ষাটোর্ধ তারা সকলেই জানেন এবং অনেকে প্রত্যক্ষ করেছেন যে ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই) ভেঙে যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) অর্থাৎ সি.পি.আই(এম) গঠিত হয় তখন এই পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের অনেক বুলি আওড়ে ছিল। তারা বলত সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবই ভারতীয় জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ। ১৯৬৪ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল কিছু কর্মসূচী। সেই কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল—১। জন্মলগ্ন থেকেই পার্টির একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মৌলিক সামাজিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রাম করা; সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা ২। মার্কসবাদ লেনিনবাদের নীতি সমূহই হবে তাদের কর্মনির্দেশিকা।

সশস্ত্র বিপ্লবের গরম গরম বুলি আওড়ে সিপিএম কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ যুবক-যুবতীদের হৃদয় জয় করে নেয়। এবং ক্রমশ কংগ্রেসের বিকল্প হয়ে ওঠে। দেরীতে এলেও জ্যোতিবাবু এই বিকল্প শক্তির নেতৃত্ব কব্‌জা করে নিলেন। দেখতে দেখতে এসে গেল ১৯৬৭ সাল। নির্বাচনী বছর। ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের তত্ত্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভেক ধরলেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের। জ্যোতিবাবু ছিলেন ঝানু বাস্তববাদী অর্থাৎ সুযোগসন্ধানী। তিনি জানতেন বিপ্লব-টিপ্লব ফালতু কথা। ওগুলো বুদ্ধু বুদ্ধিজীবীদের দলে টানার কৌশলমাত্র। আসল উদ্দেশ্য রাজ্যের ক্ষমতা দখল। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বিলাস-ব্যসন করা। তাই তিনি পার্টিকে দিয়ে পাশ করিয়ে নিলেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন তত্ত্ব। তাতে বলা হল—“সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে একটি পদক্ষেপ হলো জনগণতন্ত্র। পার্টি

লেখা আজকের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এটা দেখানো যে কিভাবে জ্যোতিবাবু কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংসদীয় ক্ষমতার অলিন্দে আবদ্ধ করে ফেলেছেন।

সংসদীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে জ্যোতিবাবুর হাতেই হাতেখড়ি হয় সিপিএম নেতাদের। সেই শুরু। তার জালে একে একে ধরা দিয়েছেন সব কটি বামদল। তার জনগণতান্ত্রিক মন্ত্রে অনেক কংগ্রেসীই মোহাবিষ্ট হয়ে সব খুইয়েছেন। শেষ শিকার প্রফুল্লচন্দ্র সেন। যাঁর কাঁধে চেপেই ১৯৭৭ সালে জ্যোতিবাবু পাকাপাকিভাবে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসলেন। অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার আর দুর্নীতির গণবন্টন করে দিয়েছিলেন তিনিই প্রশাসন ও পার্টির সর্বস্তরে। একটি কমিউনিস্ট পার্টিকে অধঃপতিত করার নাটের গুরু তিনিই। প্রথমে কংগ্রেসের লোভী, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সাহায্যে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করলেন। পরে বিভিন্ন

> **“সংসদীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে জ্যোতিবাবুর হাতেই হাতেখড়ি হয় সিপিএম নেতাদের। সেই শুরু। তার জালে একে একে ধরা দিয়েছেন সব কটি বামদল। তার জনগণতান্ত্রিক মন্ত্রে অনেক কংগ্রেসীই মোহাবিষ্ট হয়ে সব খুইয়েছেন। শেষ শিকার প্রফুল্লচন্দ্র সেন। যাঁর কাঁধে চেপেই ১৯৭৭ সালে জ্যোতিবাবু পাকাপাকিভাবে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসলেন।”**

১৯৬৪ সালে সিপিএম যে সকল গরম গরম বুলি আওড়ে ছিল, কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে গণরোষকে জঙ্গি-আন্দোলনে সংগঠিত করেছিল, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি-চালিত সিপিআই-র শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্বকে খারিজ করে দিয়েছিল;চীনের পথই ভারতের মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করেছিল; এবং এই সকল জঙ্গিপনা বিপ্লবীয়ানা দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীদের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী এক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ১৯৬৭ সাল আসতে না আসবেই সমগ্র পার্টিকে সংসদীয় ক্ষমতা দখলের নির্বাচনী রাজনীতিতে নিয়োজিত করল। কংগ্রেসকে হঠিয়ে রাজ্যের ক্ষমতাও দখল করল। কিন্তু পার্টির কিছু অতি উৎসাহী কর্মী জ্যোতিবাবুর মতো কিছু নেতার বিপ্লবী বুলিতে বিশ্বাস করে নকশালবাড়িতে সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লব শুরুও করে দিল। সেই শুরু হল সিপিএম-র নেতাদের আসল চরিত্রের প্রকাশ।

জ্যোতিবাবু কিন্তু প্রথমেই সিপিআই ছেড়ে সিপিএম-এ আসেননি। তিনি বিভাজন রেখার মাঝখানের বেড়ায় বসেছিলেন। সেইজন্য তাকে বলা হোত মধ্যপন্থী। তিনি চিন্তাভাবনা করে সিপিএমে যোগ দেন অনেক পরে। অনেকে বলেন, তিনি যখন দেখলেন সিপিআই-এ রয়ে গেছেন ডাঙ্গে, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, বাসবপুন্নাইয়ার মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতৃবর্গ, তখন সেখানে নিজের কেরিয়ার গড়তে অসুবিধা হবে ভেবে তুলনামূলক ভাবে কম নেতার ভিড় থাকা সিপিএমে যোগ দিলেন।

জনগণতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্যে শাসক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিক, কৃষক, সমস্ত অংশের শ্রমজীবী জনগণ এবং প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে পরিচালনা করার একটি কর্মসূচী পেশ করছে।” এই “প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি” কারা? জ্যোতিবাবু জানতেন নীতি আদর্শহীন বৃটিশ প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দলের মধ্যে রয়েছে বহু ক্ষমতালোভী নেতা। এদের দিয়েই কংগ্রেসকে ভাঙতে হবে। আর এদের সাহায্য নিয়েই ক্ষমতা দখল করতে হবে। এরই নাম হল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব।

এই তথাকথিত ‘জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব’-এর প্রত্যক্ষ ফসল হল ১৯৬৭’র প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। অজয় মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রীত্বের টোপ দিয়ে প্রথমে কংগ্রেসকে হটিয়ে পরে অজয় মুখার্জীকে কিরকম বেইজ্জতি করে হটিয়ে ছিলেন সেটাতো আজ ইতিহাস। সিপিএম’-র নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্টরা সেই প্রথম আংশিক ক্ষমতার স্বাদ পেল। কিন্তু কিছু বুদ্ধু বুদ্ধিজীবীর দল;যারা ভেবেছিল জ্যোতিবাবুর সিপিএম বোধ হয় সত্যিই বিপ্লবে বিশ্বাস করে, তারা সরকারি কমিউনিস্টদের মোহে নকশালবাড়ীতে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব শুরু করে দিল। অচিরেই তাদের মোহভঙ্গ হল। তাদের বিপ্লবের সাধ মিটিয়ে দেওয়া হল নৃশংসভাবে আধা সেনাবাহিনী ও সি.আর.পি.এফ নামিয়ে। গঠিত হল নতুন কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী লেনিনবাদী)। তার পরের ঘটনা আজ ইতিহাস। সে ইতিহাস

রাজ্যের আঞ্চলিক নেতাদের দিল্লীর ক্ষমতা ভোগের লোভ দেখিয়ে কংগ্রেস-বিরোধী সরকার গড়লেন। নিজে হয়ে রইলেন দাঁড়িপাল্লার বাটখারা। অর্থাৎ নির্ণায়ক শক্তি। যিনি স্বপ্নেও ভাবেননি প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দিলেন। সরকারের কাজের দায়িত্ব নিলেন না কিন্তু চাপ দিয়ে অনেক কিছু আদায় করলেন। প্রতাপ-প্রতিপত্তি দিয়ে যা অনুভব করা যায়, প্রমাণ করা যায় না।

অহঙ্কারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক চিরকালই অত্যাচারী হয়ে থাকে। জ্যোতিবাবু কিংবা তার দলের শাসকেরা তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৭০ সালে তাদের শ্রমিক সংগঠন সি. আই. টি. ইউ গড়ে মালিকদের কল্যাণে লোকসানে চলা রুগ্ন, ফোঁপরা কলকারখানাগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিয়ে দিয়ে মালিকদের বিপুল ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দিয়েছেন। পার্টি ফাণ্ডে যে টাকা যায়নি তার প্রমাণও মেলেনি। আর শ্রমিকরাও খুশি, কারণ চাকরি পাকা হল। শুধু কারখানায় সিটু ইউনিয়ন গড়তে হবে, তাহলে কাজ করারও দরকার নেই। সেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা আজ পার্টি ও প্রশাসনিক আমলাদের করায়ত্ত হয়ে নিলামে উঠছে। এখন শিল্পের কথা মনে পড়েছে। জ্যোতিবাবু বিদেশী পুঁজি আনার নাম করে বছরে দু’বার সুইস ব্যাঙ্কে হিসাব দেখতে যেতেন বলে লোকের বিশ্বাস। তিনি গ্রাম্য রাজনীতিতে প্রভাব বাড়াবার জন্য পার্টির কর্মসূচীতে ঢোকানো হল নতুন তত্ত্ব—‘কৃষক সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ হলো ধনী কৃষক।... তাদেরও

(এরপর ৪ পাতায়)

পরিবর্তন মানে কি শুধুই ক্ষমতার পরিবর্তন

তারক সাহা

জ্যোতিবাবু চলে গেলেন। বলা যায় সি পি এমেরও প্রস্থান আসন্ন যদি না এই দেড় বছরে অলৌকিক কিছু ঘটে। সিপিএম তথা বামফ্রন্টের পতন দেখে যেতে হলো না জ্যোতিবাবুকে। আদ্যন্ত সৌভাগ্যবান মানুষটি সংসারের পিতামহের মতো। কোনও বয়স্ক বা বয়স্কারা চান না তাদেরই সামনে চলে যাক তাদের অনুজরা। তেমনিই জ্যোতিবাবুও চাইতেন না তাঁর সামনেই তাঁরই প্রচেষ্টায় তৈরি ভারতের সবচেয়ে সফলতম জোট সরকার পড়ে যাক। এই অর্থে তিনি সফল।

কিন্তু ২০১১ সালে সত্যিই যদি বাম সরকারের পতন ঘটে তাহলে কি আমরা স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ হব? এমনটা ভাবা বোধহয় মূর্খামি হবে। মানুষ পরিবর্তন চায় ঠিকই, তবে সেই পরিবর্তন কীসের? সম্প্রতি দুটো ঘটনা আমাদের বেশ নাড়া দিয়েছে। প্রথমটা হলো গত ১১ জানুয়ারি বিধাননগর স্টেশন এলাকায় ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সাড়ে চারশোটি বস্তি-বাড়ি। খেটে খাওয়া মানুষের তথাকথিত উমেদার সিপিএম, তৃণমূল দু'দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেধে গেল কে প্রথম তাদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেবে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখল না ওই চত্বরে যদি দমকলের ইঞ্জিন তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারত, তবে ক্ষতির পরিমাণটা অনেকটাই কম হতে পারত। কিন্তু হলো না, বাধ সাধল অটোওয়ালাদের অবরোধ, যা সাম্প্রতিক-কালের অবরোধের ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম। সৌজন্যে—অবশ্যই মমতার দল তৃণমূল। আবার গত ১৩ জানুয়ারির চারজনের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ১২ ঘণ্টার বন্ধ। এবার সৌজন্যে—সিপিএম।

এরই পরে এক বৈদ্যুতিন চ্যানেলে বন্ধের রাজনীতি নিয়ে আলোচনাচক্রে 'আপত্তিকর' সওয়ালের জবাব দিতে না পেরে ওঠায় রাজ্যের বিরোধী নেতা পার্থবাবুর প্রস্থান। সারারাজ্য ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করল। ইদানিংকালে রাজ্যের শাসক, বিরোধী— দুই যুযুধান গোষ্ঠী বারবার বন্ধের, অবরোধের রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এসব দেখেশুনে মনে হয় যুযুধান দুই পক্ষই হয় তাদের নেতাদের ক্ষমতা নেই ক্যাডারদের বাগে আনার বা এদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে ক্যাডারদের ওপর যাদের গুণ্ডামির, অসভ্যতার তাণ্ডবে পুড়বে বিধাননগরের বস্তি অথবা অ্যাম্বুলেন্সে মরতে

মমতা ব্যানার্জী

হবে মুমূর্ষ কোনও রুগীকে।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো, জ্যোতিবাবুর শোকযাত্রায় মমতার অনুপস্থিতি। রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশব্যাপী ছোট-বড় সব রাজনৈতিক নেতারা জ্যোতিবাবুর অন্ত্যেষ্টিতে সবাই উপস্থিত—কেবল ব্যতিক্রম মমতা। দুঃখের বিষয় হলো এই অসৌজন্যতার প্রক্রিয়ায় কেবল মমতাই নয়, স্বয়ং জোতিবাবু বা তাঁর দলও কম দোষী নয়। জ্যোতিবাবুর মহাপ্রস্থান অনেক জাঁকজমকপূর্ণ হলেও এ রাজ্যের অন্য তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সবার অলক্ষ্যেই চলে গেছেন, জ্যোতিবাবু বা তাঁর দল সৌজন্যতাও দেখায়নি ওই তিন প্রাক্তনদের শ্রদ্ধা জানিয়ে।

প্রশ্ন হলো, আজকে এসবের অবতারণা কেন? আমরা ইতিহাস থেকে জানি কম্যুনিস্টরা এসব সৌজন্যের ধার ধারে না। এরা বলে থাকে, এরা চায় প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্ররাজ কায়েম করতে। দিল্লিতে হরকিযেন সিং সুরজিৎ যখন প্রয়াত হলেন তখন এদের চোখে ব্রাত্য বিজেপিকে ডাকা হয়নি শোকসভায়। কিন্তু আদবানী রাজনৈতিক সৌজন্যতা দেখিয়ে সুরজিৎকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আসলে এগুলো হলো 'পলিটিক্যাল ম্যানারইজম'। মৃত্যু ইহলোকের সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক সৌজন্যবোধের অভাব এ রাজ্যের দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যেই। এসব ঘটনা বাস্তবিক অর্থে স্বৈরতন্ত্রের ইঙ্গিতবহ।

প্রথম ঘটনায় পার্থবাবু সমস্ত সৌজন্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়েই আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এই ঘটনাও স্বৈরাচারীর ইঙ্গিতবহ। যে কোনও একনায়ক বা স্বৈরাচারী নিজের সমালোচনা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ইন্দিরা যেমন পারতেন না, সেইজন্যই ১৯৭৫ সালে তাঁকে জরুরী অবস্থা জারি করতে হয়েছে বা এর আগেও পিতৃপ্রতিম মোরারজী বা তৎকালীন তাবড় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি ইন্দিরা। ফলে কংগ্রেসে প্রথম ভাঙ্গন ধরালেন ইন্দিরা। ইন্দিরা বলয়ে সর্বদা থাকতেন তাঁর তোষামুদেরা, চাটুকারেরা, তেমনি মমতাও বেষ্টিত তাঁর চাটুকারদ্বারা।

আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা অনেকেই লক্ষ করেছেন যে, এবারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তৃণমূল দলের একমাত্র ক্যাবিনেট মন্ত্রী মমতা। বাকি ছয়জন দলীয় সাংসদ এমনকী সৌগত রায়ের মতো বর্ষীয়ান সাংসদও প্রতিমন্ত্রী। এই ঘটনাও স্বৈরাচারিতার আভাস দেয়। কারণ মমতা তাঁর এই হঠাৎ সাফল্যকে নিজের সাফল্য বলে মনে করেন। তাঁকে এক দাম্ভিকতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই দম্ভ কিন্তু মমতার পতন অচিরেই ডেকে আনবে।

ইদানিং মনমোহনের কাছে তাঁর নিজের দল এবং তৃণমূলের প্রতিমন্ত্রীরা অভিযোগ করেছেন যে, প্রতিমন্ত্রী পদ তুলে দেওয়া হোক। কারণ এইসব প্রতিমন্ত্রীরা কার্যত কর্মহীন। বেতন, অন্যান্য ভাতাদি পেলেও আমলারা তাঁদের পাত্তা দেয় না। ফাইল-পত্তর পাঠায় না। সুতরাং তাঁরা কর্মহীন মন্ত্রীত্ব চান না। এই অভিযোগের পুরোভাগে রয়েছেন তৃণমূলী প্রতিমন্ত্রীরা। আসলে কোনও দপ্তরের সাফল্য যদি কিছু হয়ে থাকে তাঁর

পার্থ চ্যাটার্জী

কৃতিত্বটুকু কেবল পূর্ণমন্ত্রীরাই পেয়ে থাকেন। নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিমন্ত্রীরা তেমন করে প্রচার করতে পারেন না তাঁদের দপ্তরের সাফল্য কী কী। এঁদেরও তো রাজনীতি করতে হয়। এঁরা রাজনীতির ময়দানে কুস্তি লড়েন। কাজেই জনতা-জনার্দনের কাছে জবাবদিহি একটু হলেও করতে হয়। এইসব অসন্তোষের কথা মমতা বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু তিনি চুপচাপ। কারণ তিনি যে তাঁর দলের শাহেন-শা। তিনি কিছুতেই তাঁর অধস্তন কোনও নেতাকে তাঁর সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে চান না।

আমরা, পশ্চিমবঙ্গবাসীরা পরিবর্তন চাই। কিন্তু তা কীসের? আমরা কি চাই বুদ্ধবাবুর বদলে কেবল মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে মমতা বসুন? আমরা কি চাই গত ৩৩ বছরে মন্ত্রীপদে থাকা চেনামুখের বদলে পার্থবাবুদের মন্ত্রীপদে থাকা? না-কি আমরা চাইব খোল-নলচে বদলে যাক পশ্চিমবঙ্গ? বন্ধ হোক বন্ধ-অবরোধের রাজনীতি, বন্ধ হোক বর্তমানের খুন-খারাপির রাজনীতি, খুলুক বন্ধ কল-কারখানা, তৈরি হোক নতুন নতুন শিল্প সম্ভাবনা, শিক্ষায় বাংলা ফের বসুক পুরনো মসনদে, কৃষিতে ক্ষেত-খামারে হরিৎ জোয়ার আসুক। পরিবর্তন মানে তো এটাই। পরিবর্তন মানে তো কুর্সিতে বসা মানুষগুলির পরিবর্তন নয়। পরিবর্তন মানে স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচার নয়। পরিবর্তন মানে সদর্থক গণতন্ত্র। পরিবর্তন মানে অরাজকতা নয়। পরিবর্তন মানে মমতা আরও বেশী বামপন্থীদের থেকে স্বৈরাচারী। পরিবর্তন মানে এই নয় যে, মমতা জ্যোতিবাবুর থেকে বেশি দাম্ভিক। সেদিন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এই প্রশ্নই রাখতে চেয়েছিলেন প্রশ্নকর্তা। উত্তর না দিয়ে সটান প্রস্থান করলেন পার্থবাবু। পার্থবাবু জেনে রাখুন, গণতন্ত্রের মূলকথা হলো পালাবদল। ইন্দিরাকে সরে যেতে হয়েছিল '৭৭-এ। হয়ত ২০১১-তে বুদ্ধবাবুর দলও সরে যাবে। কিন্তু পার্থবাবুরা মমতাদেবীকে বলবেন, তাঁকেও গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া মেনে সরে যেতে হবে যদি তিনি স্বৈরতন্ত্রকে ঠেকাতে না পারেন। ২০১১-র আগে এটাই তাঁর কানে পৌঁছে দেবেন পার্থবাবুরা—এটাই বঙ্গবাসীদের ভাবনা, আশা।

দ্বিতীয় বিয়ে বেআইনী

(১ পাতার পর)

এদিকে রাজস্থান মুসলিম ফোরামের নেতা মহম্মদ সেলিম ইঞ্জিনীয়ার দাবী করেছেন যে সরকারের উচিৎ 'মুসলিম পার্সোন্যাল ল'কে মান্যতা দিয়ে সরকারি সার্ভিস রুলের সংশোধন করা।

মিল্লি কাউন্সিলের মুজাহিদ নাকভি'র কথায় এটা সরাসরি মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ।

রাজ্য সরকারের কৌসুঁলী মনীশ ভাণ্ডারীর যুক্তি—পার্সোন্যাল ল'তে হস্তক্ষেপ নয়, সরকারি চাকুরীজীবীদের মধ্যে অনুশাসন বজায় রাখতেই সার্ভিস রুলের ক্ষেত্রে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে।

সাঁইবাড়ী চাপা দিতে

(১ পাতার পর)

ঐতিহাসিক রায়ে (বংশীলাল বনাম চন্দনলাল) জানায় যে এই ধারায় একমাত্র ন্যায়-বিচারের স্বার্থে মামলা প্রত্যাহার করা যায়। এবং মামলা প্রত্যাহার করতে হবে বিচারে দণ্ড ঘোষণার অনেক আগেই। সেক্ষেত্রেও বিচারকদের আবশ্যিকভাবে নথিভুক্ত করতে হবে কী কী কারণে তিনি মামলা প্রত্যাহারের সম্মতি দিয়েছেন। দুঃখের কথা, কলকাতা হাইকোর্ট, বর্ধমানের জেলা আদালত এবং জেলা পুলিশ দফতরের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সাঁইবাড়ি মামলার নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এমন অসার বক্তব্যে সুপ্রিম কোর্টকে বিভ্রান্ত করা যাবে কিনা সেটাই দেখার। বামফ্রন্ট সরকারের আইনজীবীদের জানাতেই হবে ফৌজদারি আইনের কোন ধারায় সাজাপ্রাপ্ত খুনিদের জেল থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। পার্টির কলমচিরা যতই কলমবাজি করুক না কেন আইনজীবীরা জানেন যে ৩২১ ধারায় খুনের মামলায় দণ্ডিত অপরাধীদের বেকসুর খালাস করা যায় না।

ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন

(৩ পাতার পর)

জনগণতান্ত্রিক মোর্চায় নিয়ে আসা যায়।...তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে ভূমিকা পালন করতে পারে।'

এইভাবে ক্রমশ সিপিএম গ্রাম্য জীবনে রাজনীতি ঢুকিয়ে গ্রাম সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। পরে শিল্প ফেরী করে কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করার রাস্তায় নেমেছে। বাঙালিকে কাঙাল বানানোর সেই কারিগর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সংরক্ষিত হচ্ছে। বাংলারই প্রধান বিরোধী নেত্রী তার জন্য দু'দিনের জায়গায় তিনদিনের আর্জি জানিয়েছিলেন। যাদের তিনি বর্বর বলেছিলেন তারাও এই অত্যাচারী দুর্নীতিগ্রস্তকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে ছুটে এসেছেন। কংগ্রেস বৃটিশের দালাল; জ্যোতি বসু কংগ্রেসের দালাল। বি.জে.পি আর তৃণমূল?

পুলিশী পাহারাতেই মোবাইলে কথা জঙ্গির

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জম্মু-কাশ্মীর থেকে প্রি-পেড মোবাইলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দশদিনের মাথায় এক বিচারাধীন কাশ্মীরী জঙ্গিকে মোবাইলে রীতিমতো গল্প করতে দেখা গেল। যদিও বন্দীর হাতে রয়েছে হ্যাণ্ডকাফ। তাও আবার পুলিশ এস্কর্ট এবং পাহারায় থেকেই। একজন অ্যামেচার ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় এই ঘটনার দৃশ্য ধরা পড়েছে। ফলে তা জনগণের গোচরে চলে আসে।

গত ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় রীতিমতো পুলিশী ঘেরাটোপে কুড়িজন বিচারাধীন জঙ্গি বন্দীকে উধমপুর জেলা কারাগার এবং জম্মুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কিস্তয়ার জেলা আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে এক টী-স্টলে চা-পানের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। তখনই নূর মহম্মদ নামের ওই জঙ্গিকে মোবাইলে কথা বলতে দেখা গেছে। তখন রাত্রি সাড়ে আটটা।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কী জঙ্গিদের সুবিধা করে দিতেই প্রি-পেড মোবাইল ফোন ব্যবহারের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠানো হয়েছে?

ওই বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে রয়েছে হিজবুল মুজাহিদিনের ছয়জন। রয়েছে আত্মসমর্পণ-কৃত কুখ্যাত জঙ্গি শের খাঁন। অন্যরা যখন চা-স্ন্যাক্স খেতে ব্যস্ত তখনই নূর মহম্মদ মোবাইলে কথা বলছিল। কুড়িজন বন্দীর পাহারায় ছিল চল্লিশজন পুলিশ। চা-পানের পর বন্দীদের কিস্তয়ার থানাতে রাত্রিবাসের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ বাহিনী। জম্মুর এস পি (হেডকোয়ার্টার) সুনীল গুপ্তা প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছেন, সম্ভবত নূরের আত্মীয়স্বজনই তাকে চা-দোকানে মোবাইল দিয়েছিল। তারা আগেই মোবাইল নিয়ে ওই চা-দোকানে অপেক্ষারত ছিল বলে ভিডিও ফুটেজ দেখে এক উর্ধতন পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন। ভিডিও ফুটেজে কোনও বিচারাধীন বন্দীর কাছে মোবাইল দেখা যায়নি।

কারাবিভাগের ডিজি অশোক ভান জানিয়েছেন, কারাগারে কোনও বিচারাধীন বন্দীর কাছে মোবাইল বা সিম কার্ড ধরা ছোঁওয়ার অনুমতি নেই। এমনকী তাদেরকে কারাগার থেকে অন্যত্র পাঠানো হলেও। জম্মুর আই জি এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সূত্রমতে পুলিশ এস্কর্টে থাকা একজন এ এস আই, একজন হাবিলদার ও দুজন কনস্টেবলকে সন্দেহ করা হচ্ছে।

কিস্তয়ার-এর এস পি ডঃ হাসিব মুঘল জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তেই এস্কর্ট পার্টির চারজনকে কর্তব্যে গাফিলতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা লঙ্ঘনে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে। তবে তিনি জানিয়েছেন, বিস্তারিত তদন্তের পর সব জানা যাবে। প্রসঙ্গত, জঙ্গিদের মোবাইলে যোগাযোগ বন্ধ করতেই প্রি-পেড মোবাইল পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছিল।

রাজ্য রাজনীতি

কমিউনিস্ট নামধারীরা দ্বিচারিতার উদাহরণ

নিশাকর সোম

সিপিএম এখন দিশাহারা অবস্থায়। কারণটা খুবই স্পষ্ট। সিপিএম বুঝতে পারছে উঠে দাঁড়ানোর আর কোনও উপায় নেই। পার্টি সদস্য-দরদী-কর্মীদের জড়ো করতে ব্যর্থ হচ্ছে তারা। জ্যোতি বসু'র স্মরণ-সভার স্থান পূরণ করা যায়নি। বহু স্থান ফাঁকা ছিল। বহু পার্টি-দরদী দূরদর্শনের মাধ্যমে এই কাজ সেরেছেন। রাজনীতির লোকেরা বোধহয় অভিনয়ে খুব অভ্যস্ত। তা'নাহলে যে প্রকাশ কারাত জ্যোতিবাবুকে প্রধানমন্ত্রীর পদ নিতে দেননি, তিনি নাকি বলছেন—জ্যোতিবাবুর পথে যাবেন! মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থাও তথৈবচ। তিনি তো জ্যোতিবাবুর মুখের উপর পদত্যাগপত্র ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তিনিও নাকি জ্যোতিবাবুর পথে চলবেন? এটা দ্বিচারিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় কি? আসলে কমিউনিস্টরা দ্বিচারিতায় অভ্যস্ত। সিপিএম ইন্দিরা গান্ধীর প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতির পদে সমর্থন করে জিতিয়েছিল। বাংলাদেশে ফৌজ পাঠানো সমর্থন করেছিল। ১৯৬৯-৭১-এর ঘটনা। এরপরই ১৯৭২-এ ধাক্কা খেয়ে দেওয়ালের লিখনে লেখা হল—"ইন্দিরা ডাইনী"। জ্যোতিবাবু এককথায় সোনিয়াকে রান্নাঘরে যেতে উপদেশ দিলেন। পরেই আবার বলেছিলেন, "সোনিয়া কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসাবে ভালই কাজ করছেন।" কমিউনিস্টদের কৌশল হলো যেন-তেন প্রকারেণ নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছানো।

একটু পেছনদিকে যেতে চাই। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলন যখন হয়েছিল—তখন কমিউনিস্ট পার্টিকে বৃটিশ সরকার বেআইনী করে দেয়। কমিউনিস্টরা যুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী ম্যাক্সওয়েল (স্বরাষ্ট্রসচিব)-কে পত্র লিখে জানান, বৃটিশ-বিরোধীদের গ্রেপ্তারে সাহায্য করবেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৪২-এর আন্দোলনকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি। তার ফলে কমিউনিস্ট পার্টিতে কোনওদিন কেন্দ্রীয় স্তরে নেতৃত্বে তিনি আসতে পারেননি।

এবার দেখা যাক নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সিপিএমের দৃষ্টিভঙ্গি। ওই পি সি যোশী-র নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রকে কুইসলিং, তোজোর কুকুর রূপে অঙ্কিত করা হয়। এর দোষ স্বীকার করা হয় ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) এক জনসভায়। কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ তাঁর বক্তৃতায় দোষ স্বীকার করেছিলেন। বুদ্ধ বাবু এবারের বক্তৃতায় সেই ভুল আবার স্বীকার করেন। যদিও ১৯৫২-এর কথা বুদ্ধ বাবুর জানার কথা নয়।

আবার দেখুন, ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারিতে 'প্রজাতন্ত্র দিবস' ঘোষণার দিন কমিউনিস্ট পার্টি বি.টি. রণদিভের নেতৃত্বে কালো পতাকা উড়িয়ে কালা দিবস পালন করেছিল। আর দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে "শহরের অভ্যুত্থান" ঘটানোর জন্য বোমা বর্ষণ করেছিল—ফলে পুলিশও বেপরোয়া লাঠি-গুলি চালায়। নিহত হয় কলিন্স স্কুলের জনৈক ছাত্র (ভাদুড়ি)। আবার এই সংবিধান-এর সাহায্য নিয়েই ১৯৫২ থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখেই কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো-(কমিনফর্ম)-এর মুখপত্র 'ফর-এ-লাস্টিং পিস অ্যান্ড পিপলস ডেমোক্রেসি'-তে লেখা হলো—"ভারতের কমিউনিস্টদের ভুল পথ পরিত্যাগ করতে হবে।" পরিত্যক্ত হলো তেলেঙ্গানা আন্দোলন, অস্ত্র—সেই অস্ত্র নেহরু সরকারের হাতে তুলে দিয়ে 'ঝুটা আজাদী'-এর স্লোগান ত্যাগ করে 'বুর্জোয়া' সংবিধান মেনে পোষা বেড়ালের মতো ধাপে ধাপে এগিয়ে এই সংবিধানের দৌলতে এ-রাজ্যে তিন দশকের বেশি সময় ধরে রাজত্ব করে চলছে। এমনকী যে-নকশালীরা সংসদকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলে থাকতেন তাঁরাও এই খোঁয়াড়ে ঢোকার জন্য যে-কোনও কৌশল নিতে দ্বিধা করেনি—করবেনও না।

সিপিএম-এর উদ্দেশ্য হলো, এ-রাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট ভাঙার চেষ্টা,— কমসে কম জোটের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। মারি অরি যেমনে পারি—এই আর কি নীতি। আসলে কমিউনিস্টরা দ্বিচারিতার জন্যই এ-দেশ-থেকে মুছে যাবে। কারণ তাঁরা দল-স্বার্থ দেখে—দেশ-জনগণের স্বার্থ দেখে না।

নেহেরু সরকার যখন প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করে তখন কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল, এই পরিকল্পনার লক্ষ্যকে সমর্থন করবে কিন্তু পন্থা সমর্থন করবেন না? এ এক হাসজারু ব্যবস্থা!

সিপিএম তৈরি "বিপ্লব" করার জন্য। জয়প্রকাশের আন্দোলনে যাব কি যাব না করে পতাকা ত্যাগ করে যোগ দিল। ইন্দিরার ২০ দফা কর্মসূচী এবং আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করাকে সমর্থন করলেন সিপিএম-এর তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরাইয়া। এর পর সুন্দরাইয়া-কে পার্টি থেকে কার্যত চলে যেতে হল। পশ্চিমবঙ্গের সালকিয়া প্লেনামে সুন্দরাইয়া-এর কৃষি বিপ্লবের নীতি ছুঁড়ে ফেলে নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারে থাকার জন্য হিন্দী বলয়ে—পার্টিকে জোরদার করার সিদ্ধান্ত হলো। তখন জনতা পার্টির নেতা অটলজী-কে বন্ধু বলে হাত ধরা হল। পরে 'বর্বর' বলা হল। আবার যখন দেখ্‌লো বিজেপি শক্তিশালী হচ্ছে তখন কংগ্রেসকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা হল সংসদে। নরসিমা রাও মন্ত্রিসভা গঠিত হলো সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের জন্য। কমিউনিস্টরা সংসদে ভোটাভুটির সময়ে বেরিয়ে যেতো। যাতে তাদের ভোটে নরসিমা সরকার না পড়ে যায়।

ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত জরুরি অবস্থাকে রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতারা সমর্থন করেছিলেন। ব্রেজনেভ ভারতে এসে মধু লিমায়েকে বলেছিলেন—"ভারতে বিরোধী দলের প্রয়োজন নেই।"

ইউপিএ মন্ত্রিসভা গঠিত করার জন্য সিপিএম-তথা বামদলগুলি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল! আবার যখন দেখলো ইউপিএ সরকারে থেকে পার্টির ব্যাপ্তি বাড়ছে না—তখনই পারমাণবিক চুক্তির কথা বলে ইউপিএ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলো। এখন আবার এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য মারফৎ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি-কে তৈল মর্দন করে 'প্রত্যাহারের' ভ্রান্তি লাঘব করার এক নিরন্তর প্রয়াস চলছে।

সিপিএম-এর উদ্দেশ্য হলো, এ-রাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট ভাঙার চেষ্টা,—কমসে কম জোটের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। মারি অরি যেমনে পারি—এই আর কি নীতি। আসলে কমিউনিস্টরা দ্বিচারিতার জন্যই এ-দেশ-থেকে মুছে যাবে। কারণ তাঁরা দল-স্বার্থ দেখে—দেশ-জনগণের স্বার্থ দেখে না। 'আমরা না বাঁচিলে—দেশের কি হইবে হাল'—এরাই নন্দলাল!

অন্য রকম

গণপতি সংগ্রাহক

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ দীর্ঘদিন ধরে গণেশ সংগ্রহ করছেন তিনি। তাঁর সংগৃহীত গণেশের সংখ্যা ৪৫০টি। সামগ্রিকভাবে সেই গণেশের সম্পূর্ণ সংগ্রহটিকে ক্যামেরাবন্দি করেছে 'ওআন্ আই মুভিস' সংস্থা। যা সম্প্রচারিত হয়েছে বৃটিশ টেলিভিশন সহ ভারতীয় দূরদর্শনে। সম্পূর্ণ সংগ্রহটির ভিসিডি প্রদর্শিত হয়েছে প্যারিস, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের শহরের প্রথম শ্রেণীর প্রদর্শনীশালায়। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে হাতির দাঁতের গণেশ, গণ্ডারের খড়্গোর গণেশ, তিমি মাছের হাড়ের গণেশ, অষ্টধাতুর গণেশসহ নানান দুষ্প্রাপ্য গণেশের প্রত্নসামগ্রী।

যিনি এই বিভিন্ন ধাতুর, বিভিন্ন মডেলের, বিভিন্ন নকশার গণেশের সংগ্রাহক; তিনি আমাদের দেশের সংস্কৃতি জগতের স্বনামধন্য মানুষ শ্রীযুক্ত শিবাশিস দত্ত। শ্রী দত্তের এই সংগ্রহের নেশা কৈশোর- কাল থেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের গণেশসহ বহু ঐতিহাসিক গণেশমূর্তি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। যারা তার 'চন্দনকাঠের শত হস্ত গণেশ' দেখেছেন বা 'শ্বেতপাথরে নির্মিত সারনাথের গণেশ' দেখেছেন বা দশমুণ্ড বিশিষ্ট রাবণ গণেশ বা পঞ্চ মুখী গণেশ দেখেছেন তারা বিস্মিত এবং মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।

শ্রীদত্তের সম্পূর্ণ সংগ্রহটি সুসজ্জিত আছে তাঁর কলকাতার বাড়ি 'কলাক্ষেত্র'-তে এবং মুম্বাইএর ফ্ল্যাট 'শুদ্ধ কল্যাণ'এ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তার বেশ কিছু গণেশ মূর্তি ভেঙে গেছে এবং চুরিও হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক টাকার গণেশ। এই সংগ্রহকে দুষ্প্রাপ্য এবং ঐতিহাসিক বলতে বাধা নেই। শ্রীদত্ত একজন স্বনামধন্য পিয়ানোবাদক এবং ঢাকা ও লণ্ডনে অবস্থিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফাউণ্ডেশান'-এর চেয়ারম্যান।

শিবাশিস দত্তের গণপতি সংগ্রহশালা। ফটো ঃ ভিজেন্দ্র জয়সোয়াল

বাংলাদেশে সন্ত্রাসী দিয়ে দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা

ধামরাই প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের ধামরাইয়ে এক প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল ও কয়েকটি হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদের চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে বারবার দখল অভিযান ও হামলা চালানো হচ্ছে। এতে ওই পরিবারটি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ২৭ জানুয়ারি সকালে ধামরাই মোকামটোলা সাংবাদিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠকালে রনজিত কুমার পৈত চৌধুরী জানান, দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রি করার বিধান না থাকলেও কুলা গ্রামের সাবেক লে. কর্নেল হেলালউদ্দিন দেশের সাম্প্রতিক জরুরি অবস্থার সময় ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে মালিকানা বিহীন ব্যক্তি দ্বারা দেবোত্তর সম্পত্তি সাবরেজিস্ট্রি দলিল করে নেন। তিনি বেলীশ্বর গ্রামের শ্রীশ্রীব্রজবল্লভ শ্যামসুন্দর জীউ বিগ্রহের নামে রেকর্ডীয় মালিক প্রয়াত মদনমোহন পৈত চৌধুরীর ১৯৪৮ সালে অর্পণনামা দায়িত্বমূলে দানকৃত দেবোত্তর সম্পত্তি কিনে নেন। আর তা দখল করতে হাবিবের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী বাহিনী দফায় দফায় অভিযান চালায়। এমনকি হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদের চক্রান্ত করছে এবং সহকারী কমিশনার (উপজেলা ভূমি) কার্যালয়ে এ দেবোত্তর সম্পত্তির নামজারি ও জমাভাগ করার আবেদন করলে এ ব্যাপারে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয় ওই বিগ্রহের সেবায়েতগণ। উচ্চ আদালত নামজারি না করার জন্য উপজেলা ভূমি কর্মকর্তার ওপর ইনজাংশন জারি করেন। অন্যদের ওপর রুল জারি করেন। তারপরও লে. কর্নেল (অব.) হেলালউদ্দিন ২৭ জানুয়ারি কুলা গ্রামের হাবিবের নেতৃত্বে ৩০-৪০ জনের সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে হিন্দুদের ওই দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করেন বলে সম্মেলনে জানানো হয়।

ভারতীয় জমি চাষ করছে বাংলাদেশী চাষীরা

সংবাদদাতা, মালদা ঃ মালদা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকলেও ১৭২ কিলোমিটার সীমান্তের ওপারে যে ভারতীয় জমি রয়েছে তা চাষ করছে বাংলাদেশীরা। হিসেব করে দেখা গেছে কেবলমাত্র মুচিয়া গ্রামের নদীর ওপারে ভারতের প্রায় ২৭৬ বিঘা জমি রয়ে গেছে। ওপারে পিলার দিয়ে ভারতীয় জমি চিহ্নিত করা থাকলেও বাংলাদেশের চামসা, ভোলাহাটের মানুষজন আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম করে দিনের পর দিন সেই জমি চাষ করা ফসল ঘরে তুলছে। বাংলাদেশের পুলিশ দেখেও কিছু বলে না। একইভাবে ইংলিশবাজার থানার বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতীয় জমি, কালিয়াচক থানারও এই রকম জমিতে বাংলাদেশীরাই চাষ করছে। কোথাও কোথাও ভারতীয় মুসলিম চাষীরা বাংলাদেশীদের জমি লিজ দিয়ে দিচ্ছে। গত ২৭ জানুয়ারি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যা নিয়ে হবিবপুরে মুচিয়া-সীমান্তে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের বি ডি আর ও বি এস এফ কর্তাদের মধ্যে বৈঠক হয়ে গেল। চোরাকারবার, অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জমিতে বাংলাদেশী মানুষদের চাষ করার সমস্যা নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বি ডি আরের পক্ষে ৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কম্পানী কমাণ্ডেন্ট মহম্মদ ফজলুল হক এবং বি এস এফ-এর পক্ষে ১২৩নং ব্যাটেলিয়ানের কম্পানী কম্যান্ডান্ট জেসি নায়েক। বৈঠক শেষে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙঘন করে ভারতীয় জমিতে চাষ করা বন্ধের ব্যাপারে চেষ্টা চালানো হবে এবং মাইকে প্রচার করা হবে। তাছাড়া শীতে কুয়াশার মধ্যে যাতে অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি ঢুকতে না পারে সে ব্যাপারেও আলোচনা হয়। এদিকে কালিয়াচক ও হবিবপুর সহ বাংলাদেশ সীমান্তে নদী থাকার জন্য বহু ভারতীয় জমি বাংলাদেশীরা দখল করে রয়েছে এবং চোরা কারবার ও অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে বলে সীমান্তরক্ষী বাহিনী স্বীকার করেছে।

ডুয়ার্সে নতুন সংগঠন ডি এম আই

জাতিদাঙ্গার মতো ঘটনা বাড়ছে

প্রাণপ্রতিম পাল, আলিপুরদুয়ার ঃ ফের মুসলিম সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছে ডুয়ার্সে। শুধু তাই নয়, ডুয়ার্সের মুসলিমদের এক ছাতার তলার নীচে নিয়ে আসার কাজ ইতিমধ্যেই সমগ্র ডুয়ার্স জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তারা একটি নতুন সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। ওই নতুন সংগঠনের নাম ডুয়ার্স মিল্লাতে ইসলামিয়া। সংক্ষেপে ডি এম আই। সম্প্রতি এই সংগঠনের পক্ষ থেকে হাসিমারা শহরে একটি সভার আয়োজন করা হয়। ডুয়ার্সের মুসলিম সমাজের উন্নয়নের আবেদন সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়াই নাকি এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। তবে এই সংগঠন মুসলিম সমাজের উন্নয়নের জন্য যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন এর পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। কয়েক বছর ধরে ডুয়ার্সসহ বেশ কয়েকটি জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাঙালী, নেপালী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জাতি-দাঙ্গার মতো ঘটনা ঘটেছে। কোচবিহার শহরে খেলার মাঠে কবর দেওয়াকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে ছিল। কোচবিহারের টাকাগাছ এলাকায়, আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ, কুমারগ্রামদুয়ার সহ বেশ কিছু জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। বেশ কিছু সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম নিজেদের স্বার্থে ঘটনাগুলির খবর প্রকাশ করা থেকে পিছিয়ে এসেছে। সমাজে মুসলিমদের মর্যাদা অক্ষত রাখতে ডি এম আই তাদের সভা থেকে মুসলিম ভাইদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। এটা যে শুধুমাত্র লোক দেখানো, তা বুঝতে বাকী নেই বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের। তবুও ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে এই সংগঠনের বিষয়ে মুখ খুলতে চায়নি কোনও রাজনৈতিক দল। একটি সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই নতুন সংগঠন তাদের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ভবিষ্যতে অসমের এ ইউ ডি এফ পার্টির মতো রাজনীতিতে আঞ্চলিক দল হিসেবে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গিয়েছে। আর এটা হলে আগামীতে ডুয়ার্সের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের চরম ক্ষতি হবে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। ২০১০ সালের মধ্যে বি পি এল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য র‍্যাশন কার্ড বিলি, কবরস্থান সংস্কারের জন্য কেন্দ্র সরকারের প্রদেয় অর্থ মুসলিমদের প্রদানের ব্যবস্থা, মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান সহ একাধিক দাবি তাদের প্রস্তাবে রয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে।

ডুয়ার্স মিল্লাতে ইসলামিয়ার জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি জুবের আহমেদ বলেন, খুব শীঘ্রই সংগঠনের বৈঠক ডাকা হবে। আর সেখানেই তাদের আগামী দিনের আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী তৈরি করা হবে।

মালদায় দুষ্কৃতীদের ধরতে গিয়ে পুলিশই খুন

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। মালদা জেলায় দুষ্কৃতীদের ধরতে পুলিশ অভিযানের সময় যেভাবে পরপর পুলিশ খুন হয়ে যাচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষ পুলিশের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে এবং নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছে। চাঁচল, হরিশচন্দ্রপুর ও কালিয়াচকের মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে পুলিশ আসামী ধরতে গেলে দলবদ্ধ ভাবে পুলিশের ওপর চড়াও হয়ে অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে হামলা চালাচ্ছে। হিন্দু গ্রামগুলিতে এইভাবে কোনও পুলিশকে খুন করার ঘটনা নেই। প্রশ্ন উঠেছে, জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যাদের ওপর দায়িত্ব রয়েছে তাদের যদি এই অবস্থা হয় তবে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? পুলিশ আক্রান্ত হওয়ায় পুলিশের মনোবলও ভেঙে পড়েছে।

আনসারুল শেখ ও তার পরিবারের সদস্যরা মিলে যে নৃশংসভাবে রতুয়া থানার পুলিশ-অফিসার সনৎ ঘোষকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করল তাতে পুলিশের পরিকাঠামো নিয়েই নিচুতলার পুলিশকর্মীরা সরব হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিজিতান্ত রাউত বলেন, স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও রাজ্য সরকার পুলিশের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে পারেনি। রাজ্যে প্রায় ৯০ হাজার পুলিশ কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে। এই অবস্থায় দু'চারজন হোমগার্ডকে নিয়ে দুষ্কৃতীদের ধরতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় এবং সেক্ষেত্রে পুলিশ আক্রান্ত হবেই। এই জন্য রাজ্যসরকার দায়ী। তিনি বলেন, মালদার এই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করব। এদিকে সীমান্তবর্তী ও মালদার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে বেআইনী অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে উঠেছে! সাধারণ মানুষের অভিযোগ বি. এস. এফ-কে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের অভিযানে যাওয়া উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রতুয়ার চাঁদপুর গ্রামে খুন হওয়া সনৎ ঘোষ একজন সৎ এবং দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর একটিমাত্র কন্যা ৫ বছরের শ্রেয়সী অরবিন্দপার্ক সরস্বতী শিশুমন্দিরে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত এবং স্ত্রী মিতা দেবীর সঙ্গে মালদা পুলিশ আবাসনে থাকতেন। গত দেড় মাসে রাতে অভিযানে বেরিয়ে দুষ্কৃতীদের হামলায় এ পর্যন্ত দুজন পুলিশ অফিসারের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১০ জন। এ নিয়ে আতঙ্কিত পুলিশ কর্মীরা অনেকেই রাতে অভিযানে বের হতে রাজি হচ্ছেন না।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত খুনের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত আনসারুল হককে পুলিশ রায়গঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করেছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছে সে বাংলাদেশ পালানোর মতলব করছিল। অতীতে দেখা গেছে মুসলিম দুষ্কৃতীরা বেশীরভাগই এই ভাবে খুন করে বাংলাদেশে গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

ব্লু-ফিল্মের রমরমা ব্যবসা কোচবিহারে

প্রাণপ্রতিম পাল, আলিপুরদুয়ার ঃ হাইটেক যুগ। চিন্তা ভাবনাও হাইটেক। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার কাছেই মোবাইল ফোন রয়েছে। কেউ কেউ আবার মাল্টিমিডিয়া মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহার করেন। বিশেষ করে অল্প বয়সী তরুণ-তরুণীদের দামি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। এই সব মোবাইল সেটে ব্লু-ফিল্ম ডাউনলোড করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। এর ফলে তাদের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটছে।

আলিপুরদুয়ার শহর ও শহরসংলগ্ন ব্লকগুলিতে ব্লু-ফিল্মের রমরমা কারবার চলছে। এই নিয়ে মহকুমার অভিভাবক মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ ছড়িয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। একটি সূত্রের খবর অনুযায়ী, শহর ও শহর সংলগ্ন বিভিন্ন সিডির দোকানে প্রায় বিনা বাধায় বিক্রি হচ্ছে দেশি-বিদেশি ব্লু-ফিল্মের সিডি। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অর্থের লোভে এই ব্যবসার জাল ছড়িয়ে দিয়েছেন বিস্তীর্ণ এলাকায়। সিডির দোকানে বিশেষ সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করলে পাওয়া যাবে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ব্লু ফিল্মের কালেকশন। বেশির ভাগ সিডি শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার ও নিম্ন অসমের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যায়। মহকুমার কিছু জায়গায় ওই সব ব্লু-ফিল্মের সিডি স্থানীয়ভাবে ডাবিং করা হয়। এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি প্রিন্ট সিডি ৪০ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হয়। আর স্থানীয়ভাবে প্রিন্ট হওয়া ব্লু-ফিল্মের সিডি পাওয়া যায় ১০ থেকে ১৫ টাকায়। কম দামে বিভিন্ন ধরনের ব্লু-ফিল্ম অনায়াসে মেলায় ছাত্ররা মুড়ি-মুড়কির মতো কিনছে। পরিবর্তন হচ্ছে তাদের মানসিকতার। বিভিন্ন ক্যাফে ও ভিডিও পার্লারগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা গিয়ে অশালীন ছবি দেখছে বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা। এক অভিভাবক বলেন, বিভিন্ন বাসে আজকাল মালপত্র তেমনভাবে চেকিং হয় না। ওই সুযোগে ব্লু-ফিল্মের সিডি দেদার ঢুকছে। স্থানীয়ভাবে প্রশাসন ক্যাফে ও ভিডিও পার্লারগুলির কোনওরকম নজরদারি করে না। উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা কৌতূহলবশে কুরুচিকর দৃশ্যগুলো দেখছে। প্রভাব পড়ছে তাদের লেখাপড়া ও স্বাভাবিক জীবনে।

আলিপুরদুয়ারের মহকুমাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব এপ্রসঙ্গে বলেন, পর্নোগ্রাফির ওপর কঠোর আইন রয়েছে। কোনও ব্যবসায়ী ওই ব্যবসায় যুক্ত আছেন প্রমাণিত হলে ওই আইনের আওতায় শাস্তি পাবেন। শীঘ্রই মহকুমা জুড়ে এনিয়ে অভিযানে নামবে প্রশাসন।

পূর্ণকুম্ভের সাজে 'মহা-প্রস্তুতি' উত্তরাখণ্ড সরকারের

থৈ-থৈ লোকারণ্যে হর-কি-পাউড়ি ঘাট। (ফাইল চিত্র)

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'নিশঙ্ক' চিত্তেই রমেশ পোখরিয়ালের উত্তরাখণ্ড সেজে উঠেছে পূর্ণকুম্ভের সাজে। একের পর এক পুণ্যদিনগুলো অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে মহানন্দে। ১৪ জানুয়ারি মকরসংক্রান্তি দিয়ে শুরু। এর পরের দিনই ছিল মৌনী অমাবস্যার সূর্যগ্রহণ স্নান। ২০ তারিখে ছিল বাসন্তী পঞ্চ মী, ৩০ জানুয়ারি মাঘীপূর্ণিমা—এসবই কেটেছে বেশ ভালোভাবে। কিন্তু আগামী ২৮ এপ্রিল অবধি এধরনের 'কার্যক্রমে'র লম্বা ফিরিস্তি রয়েছে। সেইসব ফিরিস্তির কথায় পাকাপাকিভাবে পরে আসা যাবে। তার আগে দেখে নেওয়া যাক পূর্ণকুম্ভের প্রস্তুতিটা।

রুরকী কিংবা দেরাদুন থেকে হরিদ্বারে ঢুকতে গেলে এই 'প্রস্তুতি'টা বেশ মালুম হবে। বছরখানেক পূর্বে যাঁরা হরিদ্বার দর্শন করেছিলেন তাঁরা এখন গেলে মনে করবেন—'এ কোথায় এলাম রে বাবা!' তার কারণ মাত্র একটা বছরের মধ্যেই রাস্তাঘাটগুলো অনেক প্রশস্ত হয়েছে। 'শার্লক হোমস' মার্কা কোনও চক্ষুর পক্ষেও ওখান থেকে ময়লা বা কোনও আবর্জনা পাওয়া দুঃসাধ্য। তীর্থযাত্রী আর পুণ্যার্থীদের যে জিনিসটা সবচেয়ে দরকার অর্থাৎ স্নান করার ঘাটগুলো তা চমৎকারভাবে বাঁধানো হয়েছে। বিগত তিনযুগ হরিদ্বারের যাবতীয় ওঠা-পড়ার সাক্ষী থাকা ট্রাভেল-এজেন্ট গুলশন কুমার মনে করছেন—"গত তিন দশকে হরিদ্বারের যতটা উন্নতি হয়েছে গত এক বছরে তার চাইতেও বোধহয় অনেক বেশি উন্নতি হয়েছে আর এই উন্নতি গোটা শহরটারই খোল-নলচে বদলে দিয়েছে।"

এই 'বদলে দেওয়ার' কৃতিত্বের যিনি অধিকারী, তিনি মানে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল মন্তব্য করেছেন—"কোনও পুণ্যার্থী হরিদ্বারে কুম্ভ চলাকালীন যাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধেয় না পড়েন তার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত গৃহীত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত শুধু ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকাই এর পেছনে ব্যয় করা হোত। কিন্তু এবারে কুম্ভের আয়োজনে ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পাকাপাকি নির্মাণের যে কাজ করার পরিকল্পনা ছিল তার পুরোটাই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে এবং অস্থায়ী প্রকল্পগুলির কাজও একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।"

এখনও পর্যন্ত বহু পুণ্যার্থী সমাগম হয়েছে সেখানে। সব মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের আশা এপ্রিলের শেষপর্যন্ত যতদিন পূর্ণকুম্ভ চলবে তাতে পুণ্যার্থীর সংখ্যা ৬ কোটি নিশ্চিতভাবেই ছাড়িয়ে যাবে। সে কারণে ১২ লক্ষ সাধু, চল্লিশ হাজার সরকারি আধিকারিক, এবং অন্যান্য করণিকদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বহু অস্থায়ী আস্তানা গড়ে তোলা হয়েছে। যেগুলো ইতিমধ্যেই সাধুসমাগমে একপ্রকার ভরেই গিয়েছে। ২০০৪-এর কুম্ভে সারা পৃথিবী থেকে যে সাধু-সন্ত-যোগী ও ভক্তের সমাবেশ হয়েছিল তার সংখ্যাও ছিল ১ কোটির কাছাকাছি। প্রথমে সেই হিসেবকে সামনে রেখেই এগোচ্ছিল উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার। কিন্তু মকরসংক্রান্তি উৎসব একাই সেই 'ম্যাজিক ফিগার'কে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে দেখেই পুণ্যার্থীদের জন্য আপতকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তারা।

হরিদ্বার, দেরাদুন, তেহরি এবং পাউরি— উত্তরাখণ্ডের এই চারটি জেলাকে কেন্দ্র করে প্রায় ১৩০ বর্গ কিলোমিটার প্রশস্ত কুম্ভ-এলাকা। প্রশাসনিক সুবিধার্থে পুরো কুম্ভ মেলাটাকে ১২টি জোন ও ৩২টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপারটা মাথায় রেখে ৩১টি থানা ও ৪১টি পুলিশ-চৌকি বসানো হয়েছে কুম্ভ এলাকায়। সেই সাথে ৩৬টি 'ফায়ার স্টেশন' স্থাপন করা হয়েছে অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থা হিসেবে। এছাড়া একটি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুমও বসানো হয়েছে সেখানে। আধুনিক টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার যাবতীয় সুবিধে রয়েছে ওখানে। মকর সংক্রান্তির পর থেকে চবিবশ ঘণ্টাই পুণ্যার্থীদের জন্য খোলা রাখা হচ্ছে সেটি। ভিড়ের চাপে হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে বার করতে কুম্ভমেলা হপ্তা তিনেক গড়ানোর আগেই যথেষ্ট ফলদায়ক হচ্ছে ওই কন্ট্রোল রুমটি।

এবারের মকর সংক্রান্তিতে ভিড়ে ঠাসা হরিদ্বার।

উত্তরাখণ্ড সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কুম্ভমেলায় অসংখ্য পুণ্যার্থীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারটিকে তারা খুব গুরুত্বসহকারে দেখছে। আনন্দ বর্ধন বলছেন সব মিলিয়ে পুণ্যার্থীরা অসুস্থ হলে ৪৭০০টি বিছানা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৬০টি রয়েছে মেলা এলাকায় সরকারি হাসপাতালে, ৪০০টি রয়েছে বেসরকারি হাসপাতালে; মেলার বাইরে ৬৭৭টি বিছানা রয়েছে। সরকারি হাসপাতালে এবং বেসরকারিতে রয়েছে ২,৩০৩টি বিছানা। এই ব্যবস্থার সঙ্গেই ১২ জন প্রথম সারির ও বরিষ্ঠ চিকিৎসা আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে, সেইসাথে ২৬৪ জন সাধারণ চিকিৎসা আধিকারিক, ৬০৬ জন প্যারামেডিক্যাল কর্মী, ১৯২ জন অচিকিৎসক কর্মী, ৫০টি অ্যাম্বুলেন্স এবং ১৪টি ই এম আর আই অ্যাম্বুলেন্সের বন্দোবস্তও করা হয়েছে। মেলা শুরু হবার পর থেকেই চিকিৎসকরা সোয়াইন ফ্লু-র ব্যাপারে যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বন করছেন। কুম্ভের এই এলাহি চিকিৎসা-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে এব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁদের হাতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এনিয়ে নির্দেশিকাও এসে পৌঁছেছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ীই ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে যেরকম জ্বর হয় সেই লক্ষণ কারুর দেহে প্রকাশ পেতে দেখলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে সোয়াইন ফ্লু-র যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন ডাক্তাররা। প্রসঙ্গত, এস পি এস হাসপাতাল, ঋষিকেশ ও রুরকীর দায়রা (সিভিল) হাসপাতালে আই সি ইউ-এর বিশেষ সুবিধে রয়েছে।

এবার আসা যাক, কুম্ভমেলায় যে 'মহানিত্যপ্রয়োজনীয়' জিনিসটার দিকে বর্ষার চাতকের মতো চেয়ে থাকেন পুণ্যার্থীরা অর্থাৎ স্নান করার জন্য গঙ্গার বাঁধানো ঘাটগুলোর বর্তমান অবস্থা কিরকম তার কথায়। হরিদ্বারে স্নান করার জন্য চারটে মূল ঘাট রয়েছে। যেমন—হর কি পাউরি, অস্থি পবন ঘাট, সুভাষ ঘাট এবং গৌ-ঘাট। কিন্তু এগুলো ছাড়াও ঋষিকেশ থেকে হরিদ্বার যাবার পথে স্নানের জন্য অসংখ্য ঘাট নজরে আসবে। সব মিলিয়ে ঘাটের সংখ্যা ৩০০ ছাড়াতে বাধ্য। হরিদ্বারে ১১৭টি ও ঋষিকেশে ২০০টি ঘাটকে বাঁধানো হয়েছে সরকারি উদ্যোগে। একই সময়ে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ সেগুলিতে স্নান সারতে পারবেন। এই হিসেবকে মাথায় রেখেই সরকারি সূত্রের খবর স্নান করার জন্য প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে দশমিনিট মতো সময় দেওয়া হবে। হার কি পাউরি ঘাটে প্রায় ৬০ হাজার পুণ্যার্থী একই সময়ে স্নান করতে পারবেন। কুম্ভের স্নান করার ঘাটগুলো সবমিলিয়ে প্রায় ২৫ কি.মি. লম্বা। তবে সরকারি তরফ থেকে জানানো হয়েছে সেরকম বুঝলে পরে-পশ্চাতে ঘাটের পুণ্যার্থী ধারণ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হবে। তাদের এহেন ভাবনার কারণ আগামী ১৪ এপ্রিল কুম্ভের স্নান করার আসল দিনে মেষ সংক্রান্তিতে মনে করা হচ্ছে কোটি খানেক পুণ্যার্থী একই সময় স্নান করবেন।

ওইদিন ছাড়াও আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রির দিনে স্নান করতেও প্রচুর মানুষ জড়ো হবেন—এমনটাই সাধারণভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ১৫ মার্চ রয়েছে সোমাতি অমাবস্যা, ১৬ তারিখে আছে নবসম্বৎসর আরম্ভের স্নান, রামনবমী রয়েছে ২৪ মার্চ, চৈত্র পূর্ণিমা আছে ৩০ তারিখে, এপ্রিলের ২৮ তারিখে বৈশাখ আদিমাসে হবে পূর্ণিমা স্নান। এই সবক'টি বিশেষ দিনেই বহু পুণ্যার্থী আসবেন পূর্ণকুম্ভ হরিদ্বারে। যাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জোগাতে সদা-তৎপর উত্তরাখণ্ড সরকার।

কোচ সেনাপতি বীর চিলারায়

ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল

কোচবিহার রাজ পরিবারে এক গৌরবময় চরিত্র হলো বীর চিলারায়। কোচবিহার রাজবংশের প্রথম অধিপতি হলেন বিশ্বসিংহ। তাঁর ১৯ জন পুত্রের মধ্যে মহারাজা নরনারায়ণ, সেনাপতি শুক্লধ্বজ, নরসিংহ, কমল নারায়ণ প্রভৃতি নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। শুক্লধ্বজের মা গৌড়ের পদ্মাবতী। ১৫১০ খৃঃ মাঘী-পূর্ণিমার তিথিতে শুক্লধ্বজের জন্ম। সে সময় এতদঅঞ্চলে নানা অরাজক অবস্থার অবসানে কোচ রাজবংশের শাসন ক্ষমতার উন্মেষ হয়। বিশ্বসিংহ যে পরাক্রম দেখিয়ে সকলের মন জয় করেছিলেন, সেই ধারা তাঁর পুত্রদের মধ্যেও অব্যাহত থাকে। বিশ্বসিংহ তাঁর পুত্রদের ভবিষ্যৎ কর্ম-নিরূপণ করার জন্য কতকগুলি জিনিসের পুটুলী বেঁধে সাজিয়ে রেখে এক এক জনকে একটা করে পুটুলী তুলে নিতে আদেশ করেন। তিনি এও বলেন যে, যে যেমন পুটুলী নিয়েছে, তার ভবিষ্যতও সেভাবেই তৈরী হবে। প্রথম পুত্র নরসিংহ— সোনা পাওয়াতে তাকে বিদেশ যেতে হয়। নরনারায়ণ মাটি পাওয়াতে তাকে স্বদেশে রাজত্ব করতে এবং শুক্লধ্বজ লোহা পাওয়াতে তাকে রণধর্ম পালন করতে আদেশ দিলেন।

নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ বাল্যকালে বারাণসীতে গিয়ে ব্রহ্মানন্দ বিশারদ নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে বিদ্যা শিক্ষা করেন। সেখানে এই দু' ভাই হিন্দুদের অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থ ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে সকল বিষয়ে পরিপক্ক হয়ে ওঠেন এবং উভয়েই ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এই সময় শুক্লধ্বজ শস্ত্র এবং শাস্ত্র বিদ্যায় অধিকতর জ্ঞানলাভ করেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে মহারাজ নরনারায়ণ কোচবিহারের রাজসিংহাসনে আরোহণের পর সুশিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত এবং বীরযোদ্ধা শুক্লধ্বজ মহারাজ নরনারায়ণের রাজশক্তির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় ইতিহাসে তাঁর মতো কুশলী যোদ্ধা আর কেউ ছিলেন না। বালকবয়স থেকেই শুক্লধ্বজের মধ্যে বীরের লক্ষণগুলি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এই সময় অন্যান্য ভাই এবং সহবন্ধুদের সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় তিনি অন্য সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

মহারাজা নরনারায়ণ যেমন মল্লদেব নামে পরিচিত তেমনি শুক্লধ্বজ চিলারায়, সংগ্রাম সিংহ ইত্যাদি নামে পরিচিত। কেউ কেউ বলেন যে শুক্লধ্বজ যুদ্ধের সময় শুক্লবর্ণ (সাদা) পতাকা আর সাদা রং-এর ঘোড়া ব্যবহার করতেন, সেজন্য তার নাম হয় শুক্লধ্বজ, তবে গুণাভিরাম বরুয়ার আসাম বুরুঞ্জী মতে অহোম রাজার সঙ্গে সন্ধির পণ হিসেবে একটা সাদা রংয়ের হাতী গ্রহণ করার ফলে তার নাম হয় শুক্লধ্বজ।

সে যা হোক, মহারাজা নরনারায়ণের সেনাপতি শুক্লধ্বজ অহোম রাজ্য জয় করার সময় থেকেই শুক্লধ্বজ নামে পরিচিত হন। যুদ্ধের প্রস্তুতি, সৈন্য সামন্ত, ধন-জন, সমস্ত বিষয়েই অহোম রাজাই ছিলেন বলীয়ান, তবুও শেষ পর্যন্ত শুক্লধ্বজের যুদ্ধ বিদ্যা এবং

কোচবিহার রাজপ্রাসাদ

সমর কুশলতার কাছে অহোম রাজ পরাজিত হন। শুক্লধ্বজ যুগপৎ জলপথে এবং স্থলপথে অসম আক্রমণের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর অধীনস্থ সেনাপতিগণ নৌবহর এবং স্থলপথে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের মতো শত্রুপক্ষকে আচমকা আক্রমণ করার বিষয়ে শুক্লধ্বজ ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। চিলের মত আচমকা ছোঁ মেরে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে ঘায়েল করতে পটু ছিলেন বলে শুক্লধ্বজের নাম হয় চিলারায়। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীশঙ্করদেব লিখছেন—

"ঘোরে চরি চিলা যেন ঝাম্পে রণ মাঝে।
এতে কেসে চিলারাই বোলে সবে রাজ্য।।"

মতান্তরে সংগ্রাম সিংহ শুক্লধ্বজ অহোম রাজ্য আক্রমণের সময়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক লাফে ভৈরবী (ভরালী) নদী পার হওয়ার জন্য তার নাম হয় চিলারায়।

"ঝাম্প দিয়া বীরে যদি ভৈরবী চেরাইলা।
প্রশংসিয়া সবে চিলারাই নাম থৈলা।।"

(দরং রাজবংশাবলী পৃঃ ৬৯)

পরবর্তীকালে শুক্লধ্বজ নামটা প্রায় হারিয়ে গিয়ে চিলারায় নামটাই বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চিলারায় তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে বহুযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী হিসেবে স্বীকৃত। তিনি অসম, কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা, খসিয়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি রাজ্য নিজস্ব বাহুবলে জয় করেন এবং প্রিয় ভাই নরনারায়ণের রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করেন। গৌড়রাজ্য আক্রমণ এবং তার পরিণতি সে আর এক অধ্যায়। কোচবিহার রাজ্যের সেনাপতি হিসেবে তাঁর এই ভূমিকা সর্বজন বন্দিত। এই অধ্যায় পড়তে পড়তে আমাদের রামায়ণের ভগবান রামচন্দ্র এবং তাঁর ভাই লক্ষ্মণের সুসম্পর্কের কথা বারবার মনে পড়ে।

রাজ্যের সেনাপতি হিসেবে বীর চিলারায়ের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা দুই-ই ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে তিনি সেই দায়িত্ব ও ক্ষমতার মর্যাদা সঠিক ভাবে রক্ষাও করে ছিলেন। তাঁর রণকুশলতায় রাজ্য ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তাঁর মতো সমর কুশলী সেনাপতি সত্যিই বিরল। মহারাজা নরনারায়ণ সম্পূর্ণভাবে চিলারায়ের উপরেই নির্ভর করতেন।

দেবী ভগবতীর আরাধনা কোচবিহার রাজ-পরিবারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী করে থাকে। এখানে দরংরাজ বংশাবলী (পৃঃ ১০৪) থেকে চিলারায়ের দেবী স্তুতি তুলে ধরা হল—

"বোলে মাতৃ ভগবতী জগত জননী।
পতিতপাবনী ভবভয়বিনাশিনী।।
মহিষমর্দিনী নমো শুম্ভবিনাশিনী।
নমো দেবমাতা নমো দুর্গতি-তারিণী।।"

শুক্লধ্বজ বর্তমান কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমার শিবির বা দুর্গ নির্মাণ করে বাস করতেন। এই স্থানটি আজকাল 'চিলারায়ের গড়' বলে পরিচিত। এর পাশেই জাল ধোয়া নামে গ্রামে তিনি একটি দুর্গ করেছিলেন। তাঁর নামের সঙ্গেই চিলাখানা, ঘোড়ামারা প্রভৃতি স্থানে নাম জড়িয়ে আছে। চিলারায় নিজেই বারকোদালী গ্রামে 'বড় মহাদেব' আর নাককাটি গাছে 'ছোট মহাদেব' নামে দুটি শিবমন্দির নির্মাণ করান। এই দুটি বিগ্রহই বর্তমানেও নিয়মিত পূজা করা হয়। ১৯২৮ খৃঃ কোচবিহার রাজ্যে যে সামরিক ব্যারাকটি নির্মিত হয়, সেটির নামকরণ করা হয় 'চিলারায় ব্যারাকস্' নামে। বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে। কামাখ্যা মন্দির এবং হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির সংস্কার করেন। কামাখ্যা মন্দিরে মহারাজা নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজের পাথরের মূর্তি এখনও আছে।

পূর্বকাল থেকে এতদঅঞ্চলের রাজদরবার যে সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিল তার গৌরবময় ঐতিহ্যের ধ্বজাধারী মহারাজ নরনারায়ণ এবং চিলারায়। এই সময় পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, পীতাম্বর প্রভৃতি গুণীজনদের এখানে নিয়ে আসা হয়। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ কৃত প্রয়োগরত্ন মালা ব্যাকরণ, পীতাম্বর অনূদিত ভাগবত দশম স্কন্ধ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কবি বলছেন—

একদিন সভামাঝে বসি যুবরাজ।
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কাজ।।
শুন সভাসদ জন আমার মনত।
আকুল হইছে উপস্থিত জেন মত।।
সেকথা তোমাক আমি করি উদীরণ।
না করিয়া হেলা কথা শুন একমন।।
পুরাণাদি শাস্ত্রে জেহি রহস্য আছয়।
পণ্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝায়।।
একারণে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।
নিজ দেশ ভাষা বন্দে রচিয়ো পয়ার।।"

এখানে যুবরাজ বলতে চিলারায়কে বোঝানো হয়েছে। এই পুঁথির অন্য একটি ভনিতায় কবি চিলারায় বা সংগ্রাম সিংহ সম্পর্ক বলছেন—

"কুমার সমর সিংহ আজ্ঞা পরমানে।
কহে পীতাম্বর নারায়ণ পরমানে।।"

এসব দেখে মনে করা যেতে পারে যে তিনি কেবলমাত্র রণজয়ী বীরই ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাহিত্য রসে রসিক।

এক শরণ ভাগবতী ধর্মমত প্রচারকারী শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের কোচবিহার রাজদরবারে আগমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর পদধূলি ধন্য কোচবিহারে নতুন এক ভাবনার জোয়ার আসে। শুক্লধ্বজ তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। শুক্লধ্বজের সহায়তায় এতদঅঞ্চলে মহাপুরুষের বাণী প্রচারিত হয়েছিল। তিনি এখানে একাধিক ধর্মগ্রন্থ, বরগীত, নাটক রচনা এবং অনুবাদ করেন। অনেক পণ্ডিত সেই সময়ে এখানে আসেন। কামরূপের বিক্রমাদিত্য স্বরূপ নরনারায়ণের যে সভা বিভিন্ন পণ্ডিতগণ উজ্জ্বল করত, তাতে চিলারায়েরও বিশেষ ভূমিকা ছিল।

শৌর্যবীর্য, স্বাভাবিক নিঃস্বার্থপরতা, অবিচলিত ভ্রাতৃপ্রেম, যুদ্ধ ক্ষেত্রের যোদ্ধা, কলাক্ষেত্রের কলাকার, জাতীয় চেতনার উদ্রেককারী বীরচূড়ামণি দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৫৭১ খ্রীঃ দোল পূর্ণিমার দিন ইহলোক ত্যাগ করেন।

চিলারায়ের বহুমুখী জ্ঞান ছিল। তিনি যেমন অসি চালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তেমনি প্রেম, ক্ষমা, সহিষ্ণুতাতেও আদর্শ ছিলেন। ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়েও তাঁর মনোভাব ছিল স্বচ্ছ। আজ আমরা তাঁর গৌরবময় জীবনকথা স্মরণ করে নিজেদের ধন্য মনে করি।

চিলারায়— পাঁচশত

বিবেকানন্দ চৌধুরী।। সে বড় সুখের সময় নয় তখন। ভারতীয় ইতিহাসের সূতিকাগার উত্তর ভারত তখন অস্থির। টলটলায়মান। লোদী রাজত্বের শেষ দশা। বাবরের আবির্ভাব কেবল সময়ের অপেক্ষা। এই অরাজকতা উত্তরপূর্ব ভারতেও পরিব্যাপ্ত। গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরে হিমালয় পর্বত পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাতে শতধা বিভক্ত। তিস্তা তোর্ষা ব্রহ্মপুত্র বিধৌত মোটামুটি দুর্গম এই অঞ্চল ভারতবর্ষের অংশ হলেও কিছুটা ভারত বিদ্বেষে আক্রান্ত। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আবহমান প্রবাহিত অন্তর্লীন স্রোতকে ছাপিয়ে ভারত বিরোধিতা মাথা চাড়া দিচ্ছে মূলত চৈনিক প্রভাবে প্রভাবিত অহোম রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এই ভারতবিদ্বেষের ফলশ্রুতিতেই শংকরদেব অহোম রাজ্য থেকে বিতাড়িত। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে মহারাজ বিশ্বসিংহ সঙ্কোশ ও চম্পাবতী নদীর মধ্যবর্তীস্থানে চিকনা পর্বতের উপর এক ক্ষত্রিয় রাজ্য স্থাপন করেন।

তারই তৃতীয় পুত্র ইতিহাসখ্যাত চিলারায়ের কৌশলে সেই রাজ্য প্রবল পরাক্রমী সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। চিলারায় নিজে

বীর চিলারায়ের জীবনকথা এদেশের ইতিহাসে পাঠ্য হওয়া উচিত

সাধন কুমার পাল

মহাবীর কিন্তু মহারাজ নন। সমগ্র পৃথিবীর রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এ এক অতি বিরল ঘটনা। ঐতিহাসিকদের বিচারে বিদ্যা, বুদ্ধি, বীরত্ব সমস্ত দিকেই অগ্রজ অপেক্ষা এগিয়ে। তবুও সিংহাসনের প্রতি নির্লোভ। নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য বীরত্ব দিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্যকে পরিণত করলেন সাম্রাজ্যে। ঠিক যেন মহাভারতের অর্জুন। হ্যাঁ, এমনই একজন বীরের আবির্ভাব হয়েছিল মধ্যযুগে, এদেশের কোচ রাজ্যে।

পিতৃদত্ত নাম শুক্লধ্বজ। শত্রু শিবিরের উপর আকস্মিক ভাবে চিলের মতো অব্যর্থ নিশানায় ছোঁ মেরে আক্রমণ করতেন বলে তাকে সবাই চিলারায় বলে জানতেন। পিতা পশ্চিম কামরূপ বা কোচ রাজ্যের প্রবল পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজা মহারাজ বিশ্বসিংহ। মাতা পদ্মাবতী দেবী। জন্ম ১৫১০ খৃস্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে। মহারাজ বিশ্বসিংহ তার দুই পুত্র শুক্লধ্বজ ও তার অগ্রজ মল্লধ্বজ-এর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন কাশীতে। সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের আশ্রমে। সেখানেই দুই ভাই শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। গুরুগৃহ থেকেই শুক্লধ্বজ অগ্রজ মল্লধ্বজের চেয়ে প্রায় সমস্ত বিষয়ে একটু বেশিই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

১৫৩৩ সাল। মহারাজ বিশ্বসিংহ দেহ রাখলেন। 'মহারাজ নরনারায়ণ' উপাধি নিয়ে অগ্রজ মল্লধ্বজ কামতাপুর রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। একই সাথে 'সংগ্রাম সিংহ' উপাধি নিয়ে অনুজ শুক্লধ্বজ (চিলারায়) ওই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হন। ঐতিহাসিকদের মতে মহারাজ নরনারায়ণ ছিলেন ধর্মপ্রাণ, বিদগ্ধ পণ্ডিত। আর চিলা রায় ছিলেন যুদ্ধ পরিচালনার সাথে সাথে কূট-কৌশলে অদ্বিতীয়। সাম্রাজ্য বিস্তার ও পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে মহারাজ নরনারায়ণ সম্পূর্ণ ভাবেই অনুজ চিলারায়ের উপর নির্ভর করতেন।

সেনাপতি পদে আসীন হয়ে চিলারায় তার অতুলনীয় বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলের জোরে প্রথমে অহোম রাজ্য, তারপর একে একে কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, খাসিয়া এবং ডিমরুয়া রাজ্য জয় করে ওই সমস্ত রাজ্যের রাজাদের কোচ রাজ্যের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। বীর চিলারায়ের সমর কুশলতার জন্যই যে পূর্বভারতে মহারাজ নরনারায়ণ বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতে পেরেছিলেন এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। সব মিলে বলা যায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের মতো মহারাজ নরনারায়ণের ভাইদের মধ্যে তৃতীয় চিলারায়ই ছিলেন পূর্ব ভারতের এই বিশাল সাম্রাজ্যের মূলশক্তি।

ঐতিহাসিক টয়নবির মতে আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে সমপর্যায়ের তিনজন বীরের আবির্ভাব হয়েছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, ছত্রপতি শিবাজী ও বীর চিলারায়। সমর কুশলতা, ব্যক্তিগত দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও

চিলারায়ের দুর্গ।

সাংগঠনিক ক্ষমতার নিরীখে বিচার করতে গেলে ঐতিহাসিক টয়নবির মূল্যায়ন সঠিক। কিন্তু কর্মতৎপরতার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য সর্বোপরি মানব কল্যাণ মুখী, নিষ্কাম কর্মমুখী অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের নিরীখে বিচার করতে গেলে নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে ছত্রপতি শিবাজী ও বীর চিলা রায়ের সাথে একই সারিতে রাখা যায় না। কারণ নেপোলিয়ানের জীবনভর সমস্ত কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়েছে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের জন্য; একচ্ছত্র সম্রাট হওয়ার জন্য। কিন্তু ছত্রপতি শিবাজীর সমস্ত কর্ম তৎপরতার কেন্দ্রে ছিল মোঘল সাম্রাজ্যের অন্ধকার ঘুচিয়ে একটি স্বাধীন ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা। যেখানে সমস্ত স্তরের মানুষ মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা সমর্থ স্বামী রামদাসজীর যোগ্য শিষ্য হিসেবে শিবাজী মনে করতেন তার রাজ্যের প্রকৃত রাজা হচ্ছেন তার গুরুদেব। তিনি শুধু গুরুদেবের প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। অর্থাৎ রাজা হয়েও তিনি রাজা নন, হিন্দুরাষ্ট্রের একনিষ্ঠ সেবকমাত্র। এটাই ছিল শিবাজীর জীবনাদর্শ।

এদিকে বীর চিলা রায়ের জীবনে ক্ষমতা লোলুপতা ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার কোনও স্থান ছিল না। তার সমস্ত কর্মতৎপরতার পেছনে প্রেরণার মূল উৎস ছিল ধর্মপ্রাণ অগ্রজ মহারাজ নরনারায়ণের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এ যেন নিষ্কাম কর্মে অনুপ্রাণিত মহাভারতের অর্জুন। ফল নয় নিরলস কর্মই ছিল চিলা রায়ের জীবনে একমাত্র চাওয়া-পাওয়া। কৃষ্ণ-অর্জুন, রামদাসস্বামী-শিবাজীর মতো ঋষি শক্তি ও ক্ষাত্রশক্তির আরেকটি সার্থক মহামিলনের নাম ছিল শঙ্করদেব-চিলারায়। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের সান্নিধ্যে এসেছিলেন বলেই চিলারায় হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় আদর্শের ধারক-বাহক, ত্যাগ ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক মহাপরাক্রমশালী এক আদর্শবান বীর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এদেশের রাষ্ট্রীয় জন-সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস এ দেশে সেই পুরাণের সময়কাল থেকেই দেখা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ছোট্ট ছোট্ট রাজন্য-বর্গের আনুগত্য যাচাইয়ের জন্য শক্তিশালী রাজচক্রবর্তীরা অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো অনুষ্ঠান করতেন। এসবের পেছনে একটিই উদ্দেশ্য থাকত। যাতে ছোট ছোট রাজন্য বর্গের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে বিদেশী শক্তি এদেশে থাবা বসাতে না পারে। বীর চিলা রায়ের সাম্রাজ্য বিস্তারের পেছনেও হয়তো এমনই কোনও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। কারণ উনি এত রাজ্য জয় করেছেন যে ইচ্ছে করলেই অগ্রজের সাথে বিরোধ না করেও বিজিত রাজ্যগুলোর রাজা হতে পারতেন। কিন্তু তা না করে আদর্শ 'রাজধর্ম' অনুসারে রাজার সহোদর ভ্রাতা হয়েও সমস্ত রকম সংকীর্ণতা কে দূরে ঠেলে তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি রাজসমীপে সমর্পণ করে আদর্শ প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি হয়ে উঠেছেন। এখানেই চিলারায়ের মহত্ত্ব।

এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বীরদের কাহিনী এদেশের বর্তমান প্রজন্মের কত জন মানুষ জানেন? কতজন জানেন যে রাজধর্ম মানে ভোগবিলাস আর ক্ষমতার দম্ভ নয়? রাজধর্মে আর ত্যাগধর্মে কোন পার্থক্য নেই। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসে অর্থাৎ পুরাণে এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে রাজসিংহাসন গৌণ, সততা, মূলবোধ, কর্তব্য নিষ্ঠা—এগুলোই মুখ্য। রাজা মানে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। জনতা জনার্দনের সেবক। ভারতের আদর্শ রাজারা এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। সে জন্য রাজকার্যে নিযুক্ত থাকার অর্থ ছিল প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরের সেবা করা। এখানে ব্যক্তির ক্ষমতার দম্ভ বা অহংকারের স্থান নেই। ফলে সত্য রক্ষার জন্য বা প্রজাস্বার্থে রাজা অনায়াসে যেমন রাজ্যপাট ছেড়ে বনবাসী হতে পারতেন তেমনি রাজার থেকে গুণবান হয়েও যে কেউ তার অর্জিত সম্পদের সবটুকু রাজার জন্য অর্থাৎ রাজ্যের জন্য নিবেদন করতে কুণ্ঠিত হতেন না। এটিই হলো সনাতন ভারতের রাজধর্ম। এই ধর্ম অনুসারে রাজা আর রাজ্যে কোনও তফাৎ নেই। অর্থাৎ রাজ্যের প্রজাদের সুখ, দুঃখ, বেদনা রাজার ব্যক্তিজীবনের অনুভূতিগুলোর সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। এখানে রাজা বলতে যেমন ব্যক্তিকে বোঝায় তেমনি রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ও রাজকর্মচারীর সমষ্টিকেও বোঝায়।

এদেশে প্রতিদিনের ধর্মচর্চায় 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' শীর্ষক ভজন কীর্তনের মাধ্যমে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজা রামচন্দ্রের গুণাবলী সমাজে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা আমাদের ঋষি-মুনিরা করে গেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসে সেরকম কোনও প্রয়াস তো দূরের কথা বরং উল্টো প্রয়াসই হয়েছে। এ দেশের পাঠ্যসূচীভুক্ত ইতিহাসের পাতা নেপোলিয়নের বীরত্ব-গাথায় ভরা থাকলেও শিবাজীর উল্লেখ রয়েছে 'পার্বত্য মুষিক' হিসেবে আর বীর চিলারায় তো 'মুষিক' হিসেবেও স্থান পাননি। বছরের পর বছর ধরে এদেশের ইতিহাসে পড়ানো হচ্ছে ঔরঙ্গজেব ছিলেন দূরদর্শী, অসীম সাহসী, অক্লান্ত যোদ্ধা, উচ্চ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও কূটনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ। কারণ উনি অসুস্থ পিতা শাহজাহানকে আগ্রা দুর্গে বন্দী রেখে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা, সুজা ও মুরাদকে হত্যা করে মোঘল সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হতে পেরেছিলেন। এসব দেখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন ভারতের ইতিহাসের নামে এদেশে যা পড়ানো হয় তাতে খুব সামান্যই ভারত আছে।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে পথ ধরে গড়ে উঠে কোনও দেশের ভবিষ্যত। বলার অপেক্ষা রাখে না এ দেশে বর্তমানে যে মূল্যবোধহীন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার থেকে পরিত্রাণের জন্য বহু উপায়ের একটি উপায় দেশের প্রকৃত ইতিহাস পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করে তার মূল্যবোধের প্রবাহকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালিত করা।

বীর চিলারায়ের জন্মের ৫০০ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যোগ্য মর্যাদা সহকারে এই বীরের বীরত্ব গাথা সমগ্র দেশের পাঠ্য ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হউক। সেই সাথে দিল্লির সংসদ ভবনসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলোতে স্থাপিত হউক এই বীরের তেজোদৃপ্ত মূর্তি।

> **"ঐতিহাসিক টয়নবির মতে আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে সমপর্যায়ের তিনজন বীরের আবির্ভাব হয়েছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, ছত্রপতি শিবাজী ও বীর চিলারায়।"**

শত বছরের প্রেক্ষিতে

রাজা ছিলেন না। রাজার দেওয়ানমাত্র। রাজা তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নরনারায়ণ, কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে চিলারায় ছাড়া কামতা সাম্রাজ্য কোনও মতেই বাস্তবরূপ নিত না। বীরত্বের সঙ্গে মেধা যুক্ত হলে কি ঘটতে পারে তার উদাহরণ চিলারায়। কেবল পরাক্রমী যোদ্ধা নন তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কূট কৌশলী। তিনি বুঝেছিলেন ধর্ম ও সংস্কৃতি সহ কামতা রাজ্য সুরক্ষিত রাখতে হলে চৈনিক ভাবাদর্শে লালিত অহোম রাজ্যকে শায়েস্তা করা দরকার। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি অহোম আক্রমণ করেন এবং অহোমরাজকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। চিলারায়ের জীবনে শংকরদেবের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক। শংকরদেবের প্রভাবেই তিনি ক্ষাত্রবীর হয়েও রাজর্ষিতুল্য, বৈষ্ণবের মতো ক্ষমাশীল। পরাক্রম অনেক সময় বোধকে বিনষ্ট করে, অন্যদিকে অপরিমেয় বিনয় স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষইয়ে দেয়। কিন্তু এই বিপ্রতীপ গুণাবলী একত্রিত হলে জীবন পূর্ণতা পায়। চিলারায় এই পূর্ণতার নিটোল উদাহরণ। সাধে তো আর মহামতী টয়েনবি তাঁকে নেপোলিয়ন ও শিবাজীর সঙ্গে একাসনে বসাননি।

কমিশনের কাণ্ড জ্ঞানহীনতা

বর্তমান ইংরেজী বর্ষের গোড়ার দিকে বিশেষভাবে অনুভূত হয় যে, নাম প্রচারের ও ব্যক্তিগত উচ্চাশার কামনায় যোগেনআলি মণ্ডলরা বারেবারে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে বাংলায় রাজনীতির আকাশে এখন যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমন রাজেন্দ্র সাচার বা রঙ্গনাথ মিশ্রও। রাজেন্দ্রনাথ -রঙ্গনাথ জুটির উদ্দেশ্য হ'ল, কমিশনের পদ ব্যবহার করে, নিজেদের খ্যাতির প্রসার ও প্রচার ঘটানো। ভারতবিদ্বেষী রাজনীতির ফেরিওয়ালা ও দেশভক্তিহীনদের কাছে, তাদের স্বকাজকর্মের খোরাক ও প্রেরণার কাজ করে যাচ্ছে এই সব কমিশন। ফলে সরকারী টাকার মাধ্যমে এভাবে দেশ বিরোধী কাজে উৎসাহ আসে। স্বদেশী জলে পরিপুষ্টহীন এইসব কমিশনের ইস্তেহার—দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ, দেশবিরোধী শক্তির উদয় ও শ্রীবৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাবে। ভারতবর্ষ—ভারত থেকে মুছে যাবে, তার এও এক স্বদেশে থেকে পরদেশীর পরিকল্পনা।

রাধাকান্ত ঘোড়াই, ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব-মেদিনীপুর।

চীনা বিপদ

চীন ভারত সরকারকে আবার ১৯৬২ সনের সংকেত জানাচ্ছে। এই ভয়ংকর ড্রাগনের বিরুদ্ধে সারাদেশের মানুষ এখনই রুখে না দাঁড়ালে, দেশের ভবিষ্যৎ যে কোনপথে এগিয়ে যাবে তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে। চীন দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করেছে মাওবাদী সন্ত্রাস আর সীমান্তে সৃষ্টি করছে যুদ্ধের বাতাবরণ। কারণ, চীন বৈধ এবং অবৈধ ভাবে তাদের দেশের উৎপাদিত নিম্নমানের পণ্যসামগ্রী উৎকৃষ্টতার আবরণ লাগিয়ে ভারতের বাজার এমন ভাবে দখল করছে, যাতে ভারতে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী যথেষ্ট উচ্চমানের হওয়া সত্ত্বেও মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে বিক্রি না হয়। এর সঙ্গে চীনের আর একটি উদ্দেশ্য হলো, ভারতের ছোট ব্যবসায়ীরা ভারতীয় মাল কেনা বন্ধ করে দিয়ে সস্তায় চীনা মাল নিয়ে ফাটকা ব্যবসায় সামিল হয়। যা এখনই ভারতের বাজারে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি না হলে সরকারের পক্ষেও ঢালাও চীনা-পণ্য রোধ করা সম্ভব নয়।

শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

মূল্যবৃদ্ধি ও মোবাইল

বর্তমানে টিভি বা সংবাদপত্রগুলিতে ব্যাপক ভাবে প্রচার হচ্ছে বিভিন্ন টেলিফোন কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। কোনওটা দিচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে এক পয়সা হিসাবে কথা বলার সুবিধা, কেউ আরও কিছু, আমরা সাধারণ মানুষ তাই নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত। বাসে-ট্রেনে, চায়ের দোকানে সর্বত্রই আলোচনার বিষয়বস্তু একটাই, 'কে কত কমে ফোন করার সুবিধা দিচ্ছে'! অপরদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে। আজ চিনি ৩৪ টাকা তো আগামীকাল হয়ে যাচ্ছে ৪২ টাকা, বাজারের কোনও জিনিসের দামই স্থির নেই। কিছুদিন আগেও শিল্পায়নের শ্লোগান দিতে গিয়ে আমাদের রাজ্যের রথী-মহারথীরা বলতেন পশ্চিমবঙ্গ নাকি কৃষিপণ্য, উৎপাদনে প্রথম। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষিপণ্যের দাম বেড়ে চলেছে প্রতিদিন। পর্যাপ্ত পরিমাণ আলু হিমঘরে মজুত থাকলেও আমাদের কিনতে হলো কেজি প্রতি ২০ টাকায়। কিন্তু কখনোই এমন হয়নি যে বাজার থেকে আলু উধাও, তাও তার দাম থাকল ২০ টাকা বা কখনও তারও বেশী। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা ও মজুতদাররা নিজেদের ইচ্ছামতো বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে আর আমাদের সরকার চুপচাপ দেখে চলেছে। কিন্তু এবিষয়ে আমাদেরও কারোর মাথাব্যথা নেই, আমরা ব্যস্ত ১ পয়সায় প্রতি সেকেণ্ডের হিসাবে ফোন করতে। প্রকৃতপক্ষে কিছুদিন আগেই আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেসের হাত শক্ত করে দিয়েছি, সেই শক্ত হাতের থাপ্পড় যে খেতে হবে তাও বোধহয় আমরা ভেবেই নিয়েছি। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা বেশ আছি ফোনে কথা বলে। কিন্তু আমরা কতদিন এইভাবে রাজনীতির শিকার হবো ভেবে দেখেছি কি?

—রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান

চিঠিপত্র

'বন্দেমাতরম্'

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত 'স্বদেশ মন্ত্র বন্দেমাতরম্' শীর্ষক নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ২১।১২।০৯) 'গণপরিষদের বিতর্ক, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ২-সূত্র উল্লেখ করে বলেছেন—'জনগণমন' গানটির সাথে 'বন্দেমাতরম্' গানটিতে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ডঃ রক্ষিতের বক্তব্য নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) একটিই হয়, একাধিক নয়। গণপরিষদে বিতর্ক অবশ্যই হয়েছিল; কিন্তু শেষপর্যন্ত 'জনগণমন' গানটিই জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম্' শীর্ষক প্রতিবেদন (স্বস্তিকা, ১১।৯।০৬) গূঢ়পুরুষ সেকথা জানিয়ে বলেছেন—'জনগণমন' গানটি ব্যাণ্ডে বাজানো সহজ বলে 'বন্দেমাতরম্'-এর পরিবর্তে 'জনগণমন'-কে জাতীয় সঙ্গীত করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দেমাতরম্'-এর অনুপযোগিতার কথা উল্লেখ করে পণ্ডিত নেহরু তাঁর জবাবী পত্রে (তাং ১৫।৬।'৪৮) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে লিখেছিলেন—এখনকার পরিস্থিতিতে 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে একেবারেই খাপ খাইতেছে না। তবে, 'বন্দেমাতরম্' আমাদের জাতীয় ভাবোদ্দীপক গান হিসেবে চিরকালই মর্যাদা পাবে ("...that in the present context Bande Mataram is completely unsuitable as a national anthem. It is and it will continue to be a national song which is intemately connected with our struggle for freedom and which will be revered accordingly")/ বলা বাহুল্য, National Anthem Ý National Song সমার্থক নয়; এক পঙ্ক্তিভুক্তও নয়।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

সমাবেশ সমাচার

মনোমোহন রায়ের স্মরণসভা

গত ১৬ জানুয়ারি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক স্বর্গীয় মনোমোহন রায়-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঠাকুর পঞ্চানন স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও স্মৃতিচারণ করা হয়। এছাড়াও ওইদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা, স্বয়ংসেবক, বিবিধক্ষেত্র সংগঠনের কার্যকর্তা ছাড়াও অনেক সাধারণ মানুষ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ঠাকুর পঞ্চানন স্মৃতি সমিতির পক্ষ থেকে গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, সঙ্ঘের কোচবিহার বিভাগ সেবা প্রমুখ সাধন পাল ও জেলা সঙ্ঘচালক সতীশ চন্দ্র বর্মন

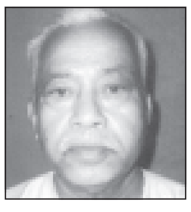

প্রমুখ ওই স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন। সাধন পাল 'স্বস্তিকা'কে লেখা একটি পত্রে জানিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় মনোমোহন রায়-ই তাঁকে বীর চিলা রায়-কে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার কথা বলেন এই সংবাদপত্রে। একথা হওয়ার সপ্তাহখানেক বাদে তিনি যখন লেখাটি লিখতে শুরু করেন তখনই বেজে ওঠা টেলিফোনে এক স্বয়ংসেবকের কণ্ঠস্বর তাঁকে জানিয়ে দেয় মনোমোহনদা আর নেই।

স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে বেলঘরিয়া ও নিমতা অঞ্চলে একটি প্রভাতফেরীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রভাতফেরীর উদ্বোধন করেন বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী একত্বানন্দ মহারাজ। বেলঘরিয়া রেলস্টেশন সংলগ্ন স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করে আর এস এসের সহ-বিভাগ সঙ্ঘচালক মানস মিত্র প্রভাতফেরীর সূচনা করেন। প্রায় শ'দুয়েক মানুষ এই প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণ করেন।

বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৯, হাওড়া জেলার মুন্সিরহাটের অন্তর্গত শঙ্করহাটী গ্রামে 'বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের' পঞ্চদশ বর্ষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হলো।

অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শান্তিরঞ্জন ঘোষ (মাজু আর, এন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিয়ব্রত সরকার (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ) এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক সনৎ ঘোষ মহাশয় (প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক)। এছাড়াও শিশুমন্দিরের পরিচালন সমিতির সকল কার্যকর্তাই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

অতিথিগণের প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্যে ছিল, বর্তমান সরকার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিশুমন্দিরের দেওয়া শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য। তাঁরা শিশুমন্দিরের শিক্ষাব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনাকে স্বাগত জানান। অধ্যাপক সনৎ ঘোষ শিশুমন্দিরের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকল অভিভাবক অভিভাবিকাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে শিশুমন্দিরের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী মল্লারী দাশগুপ্ত।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন শিশুমন্দিরের প্রধানাচার্য শুভেন্দু সরকার।

শোক সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার স্বয়ংসেবক ও বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য (ভোলাদা) গত ৫ জানুয়ারি পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বহরমপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ৮ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি স্ত্রী-পুত্র-দুই কন্যা নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলা সম্পর্ক প্রমুখ শঙ্কর চৌধুরীর মাতৃদেবী সুশীলা চৌধুরী ৭৩ বছর বয়সে গত ১৪ জানুয়ারি মালদা দিশারী নার্সিং হোমে সজ্ঞানে পরলোক গমন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ সুশীলা দেবী মৃত্যুকালে ৭ পুত্র ও ২ কন্যাকে রেখে গেছেন।

* * *

মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম প্রখণ্ডের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ক্ষৌণীন্দ্র নাথ রায় গত ২৯ ডিসেম্বর '০৯ সনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

* * *

হুগলি জেলার দ্বারহাট্টা রাত্রি শাখার মুখ্যশিক্ষক যদুপতি পালের মাতৃদেবী মহামায়া দেবী গত ২১ জানুয়ারি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৬ বছর বয়সে মারা যান। তিনি ৫ পুত্র ও ১ কন্যা সহ নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

* * *

বালুরঘাটের চকভৃগুশাখার স্বয়ংসেবক সুব্রত সরকারের বাবা সুকুমার সরকার মাত্র ৪৮ বছর বয়সে আচমকা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৯ জানুয়ারি মারা যান।

* * *

গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রভাত কুমার নন্দী ৮০ বছর বয়সে গত ১৯ জানুয়ারি মালদা হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তিনি অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক

সঙ্ঘের কার্যবাহ ছিলেন ও পরবর্তীকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সহ-সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব সুনামের সঙ্গে পালন করেন। বর্তমানে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের ওই জেলার সভাপতি পদে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে স্ত্রী সহ দুই কন্যা ও জামাতা বর্তমান।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বালুরঘাটের স্বয়ংসেবক রামচন্দ্র বসাকের মাতৃদেবী প্রভাবতী বসাক গত ১৮ জানুয়ারি ৮২ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোক গমন করেন। তাঁর ৬ পুত্র, ২ কন্যা এবং নাতি-নাতনিরা বর্তমান।

* * *

দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলির রামজীবনপুরের স্বয়ংসেবক যজ্ঞেশ্বর মাহাতো গত ১৯ জানুয়ারি ৬০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ, প্রথম বর্ষ শিক্ষিত ছিলেন।

পরলোকে ডঃ রামচন্দ্র মান্না

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ডঃ রামচন্দ্র মান্না গত ২৭ জানুয়ারি পরলোক গমন করেছেন। রামবাবু একজন অধ্যাত্মবাদী, স্বামী বিবেকানন্দ অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। বেশ কিছু দিন অসুস্থও ছিলেন।

হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অন্তর্গত গঙ্গাধরপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ডোমজুড় থানার দঃ ঝাপড়দহ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। সকলের কাছে তিনি মাস্টারমশাই বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। পরিবারে বোন ও দুই ভাই বর্তমান। চাকুরী জীবনের উপার্জিত অর্থ সমাজের কাজেই ব্যয় করতেন। চক্ষু পরীক্ষা ক্যাম্প, গ্রন্থাগার, পুস্তকদান, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের কাছে নানান ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কয়েকবার বাংলার সঙ্ঘশিক্ষা বর্গে বর্গাধিকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বস্তিকা পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন।

দেবী ভবানীর ভক্ত বীরশ্রেষ্ঠ চিলারায়

হিমাদ্রি শঙ্কর ভট্টাচার্য

আসামের বিকসা, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানের ভুঁইয়াদের পরাজিত করে ১৪৯৬ খৃঃ বিশ্বসিংহ স্বাধীন কামতাপুর (কোচবিহার) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৫৩৩ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ সময় নানা যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে তিনি রাজ্য বিস্তার করেন। মহারাজ বিশ্বসিংহের ১৮ জন পুত্র ছিলেন। তার মধ্যে প্রথম নরসিংহ, দ্বিতীয় নরনারায়ণ, তৃতীয় শুক্লধ্বজ বা চিলা রায়।

একবার এক যুদ্ধে বিশ্বসিংহ পরাজিত হয়ে একাকী এক জঙ্গলে শ্রান্ত-ক্লান্ত, হতাশাগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিলেন। এমন সময় এক বনবাসী কিশোরী তাঁকে কিছু খাবার দিয়ে সম্মুখে এক ছোট পাহাড়ের (টিলা) গুহা দেখিয়ে বললেন, "ওর ভিতরে ভবানীদেবীর কষ্টিপাথরে খোদিত ছোট একটি মূর্তি আছে। ওই মূর্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়মিত পুজো করলে মায়ের আশীর্বাদে সে বড় রাজা হবে"—এই বলে কিশোরী অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিশোরীর কথামতো বিশ্বসিংহ ভবানী দেবীর মূর্তির নিয়মিত পুজো করে মায়ের আশীর্বাদে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ভবানী দেবীর সেই কষ্টিপাথরের মূর্তি এখনও কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীমদনমোহনের সিংহাসনের বাঁ পাশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুজো পেয়ে আসছেন।

মহারাজ বিশ্বসিংহ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ ও তৃতীয়পুত্র শুক্লধ্বজকে কাশীতে পড়াশোনা করতে পাঠান। সেখানে তাঁরা নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে পিতার মৃত্যু সংবাদে দ্রুত দেশে ফিরে আসেন এবং বড় ভাই নরসিংহের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ বা বলপূর্বক নরনারায়ণ রাজ সিংহাসন লাভ করেন। রাম-লক্ষ্মণের মতো নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

মহারাজ নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ বিদ্বান, বুদ্ধি মান ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তার উপর তাঁরা মা কামাখ্যা ও ভবানী দেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁরা জানতেন মা কামাখ্যার প্রতিরূপ হচ্ছেন ভবানীদেবী, যেমন পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রে মা দুর্গার প্রতিরূপ হচ্ছেন বিমলা দেবী।

ভারতবর্ষে চারটি সিদ্ধ পীঠ—১। কামাখ্যা ২। পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্র ৩। কন্যাকুমারী ৪। জ্বালামুখী। সমস্ত কোচবিহার রাজ্য, তদানীন্তন নাম কামতাপুর, মা কামাখ্যার সিদ্ধ পীঠের অন্তর্গত। পুরীতে জগন্নাথের লক্ষ্মী বা রুক্মিনী নেই। জগন্নাথ ভৈরব এবং বিমলাদেবী ভৈরবী। কোচবিহারেও তেমনি মদনমোহনের রাধা নেই। মদনমোহন ভৈরব ভবানী দেবী ভৈরবী। পুরীতে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব আশ্রয় নেন ও দেহ রাখেন। কোচবিহারে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শঙ্করদেব আশ্রয় নেন ও দেহ রাখেন।

১৫৩৩ খৃঃ মহারাজ নরনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি কোচবিহারের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন এবং তাঁর সময়ে কোচবিহার রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত ছিল। মহারাজ নরনারায়ণের রাজ্যসীমা ছিল— পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে ত্রিহুত (মিথিলা) সীমান্ত, উত্তরে তিব্বতের সীমান্ত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট ময়মনসিংহ জেলার পূর্বার্দ্ধ নিয়ে চট্টগ্রামের নিকট বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রায় ৯৪ হাজার বর্গমাইল।

মহারাজ নরনারায়ণ এই বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা শুক্লধ্বজের সাহায্যে জয় করেন। শুক্লধ্বজ মহারাজ নরনারায়ণের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধে শুক্লধ্বজ চিলের মত ক্ষিপ্র গতিবেগ সম্পন্ন ছিলেন বলে তাঁকে 'চিলা রায়' নামে অভিহিত করা হয়।

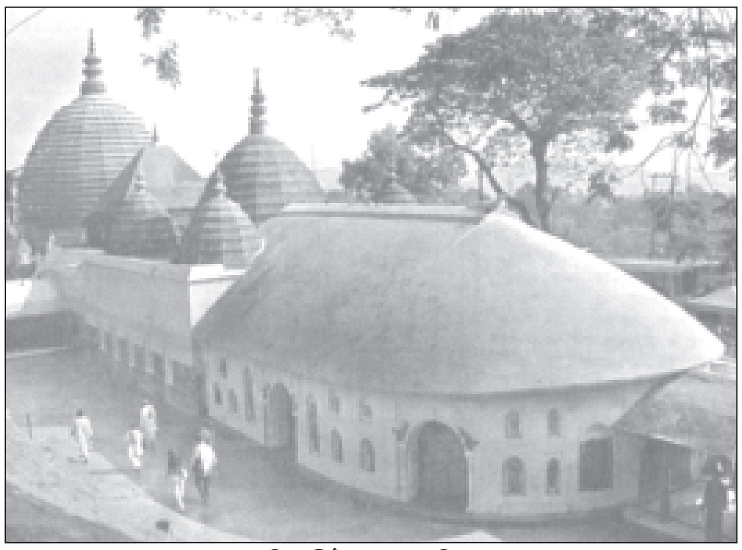

সিদ্ধ পীঠ কামাখ্যা মন্দির

মহারাজ নরনারায়ণ ও ভ্রাতা শুক্লধ্বজ মা কামাখ্যার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত ছিলেন। বর্তমান কামাখ্যা মন্দির তাঁদেরই তৈরি এবং পূজাদির ব্যবস্থা তাঁরাই করে দেন। এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দু'পাশে ওই রাজাদের মূর্তি আছে।

দুর্জয় সাহস ও মা কামাখ্যার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি শুক্লধ্বজকে অপরাজেয় সেনাপতিতে পরিণত করেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্র এবং শত্রুপক্ষের বলাবল জেনে তিনি নতুন নতুন রণকৌশল স্থির করতেন। শত্রুপক্ষ বুঝতেই পারত না কখন কোনদিক দিয়ে কীভাবে তিনি আক্রমণ করবেন। শোনা যায় গৌহাটি আক্রমণের সময় ভরালু নদী তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফ দিয়ে পার হয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে খুব সহজে জয়লাভ করেন।

গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের সঙ্গে মহারাজ নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের রাজ্যের বিস্তার নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে যুদ্ধ বিগ্রহ চলছিল, কিন্তু হুসেন শাহ বিশেষ সুবিধে করতে পারছিলেন না। তাই তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি খবর পেয়েছিলেন যে অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী নিয়ে শুক্লধ্বজ মাঝে মাঝে মা কামাখ্যা দর্শনে যান। সে সুযোগ গ্রহণ করে একদিন বেশ কিছু সেনা নিয়ে হুসেন শাহ কামাখ্যা পাহাড়ে ওঠার রাস্তার দু'পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে অপেক্ষা করে শুক্লধ্বজকে সহজেই বন্দী করে গৌড়ে নিয়ে এলেন।

মহারাজ নরনারায়ণ ভাইয়ের বন্দীর খবর পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন এবং কামাখ্যা মায়ের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। কারণ হুসেন শাহের বিরুদ্ধে এখন যুদ্ধ যাত্রা করলে ভাই শুক্লধ্বজের বিপদ বাড়বে। এদিকে শুক্লধ্বজও কামাখ্যা মাকে বললেন—"মা তোমার দর্শনে এ বিপত্তির নিষ্পত্তি করে দাও।" মা দর্শন দিয়ে শুক্লধ্বজকে অভয় দিলেন।

শুক্লধ্বজ কয়েকদিন বন্দী থাকার পর হুসেন শাহের মাকে বিষাক্ত সাপে কাটে। বহু চেষ্টা করেও হুসেন শাহ মাকে ভাল করতে পারছেন না। মুমূর্ষু অবস্থায় মা দেখলেন এক বৃদ্ধা তাঁকে বলছেন— "তোমার ছেলে আমার ভক্ত ছেলে শুক্লধ্বজকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রেখেছে। এখনই তাঁকে সসম্মানে ছেড়ে দিতে বল এবং তাঁকে দিয়ে কামাখ্যা মায়ের নাম করে তোমাকে ঝেড়ে দিতে বল, তাহলেই তুমি ভাল হয়ে উঠবে।" হুসেন শাহের মা হুসেন শাহকে তাই বললেন এবং হুসেন শাহ তৎক্ষণাৎ তাই করলেন এবং তাঁর মা ভাল হয়ে উঠলেন। তারপর হুসেন শাহ ভাইয়ের মতো সমাদর করে প্রচুর উপঢৌকন সহ শুক্লধ্বজকে মুক্তি দিলেন। তখন শুক্লধ্বজ হুসেন শাহের কাছে তাঁর রাজসভার দুই পণ্ডিত পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য (বিদ্যাবাগীশ) ও পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশকে চাইলেন কোচবিহারে নিয়ে আসার জন্য। এই দুই পণ্ডিত শুক্লধ্বজের বন্দী অবস্থায় জল ও খাবার দিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপে শুক্লধ্বজ তাঁদের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। প্রথমত, হুসেন শাহ ও পণ্ডিতদ্বয় শুক্লধ্বজের প্রার্থনায় সম্মত হননি;কিন্তু শুক্লধ্বজের বিশেষ প্রার্থনা ও অনুরোধে সকলে রাজী হন এবং পণ্ডিতদ্বয় শুক্লধ্বজের সঙ্গে কোচবিহারে আসেন। মহারাজ নরনারায়ণ পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং রাজসভার প্রধান পণ্ডিতের পদে বৃত করেন। পরে মহারাজ নরনারায়ণের অনুরোধে সহজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ "প্রয়োগরত্নমালা" নামে এক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। এছাড়া তিনি "মুক্তি চিন্তামণি," "বিষ্ণুভক্তিকল্পলতা" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ-খানি কোচবিহার, আসাম ও নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজে সাদরে গৃহীত হয়। এই পুরযোত্তম বিদ্যাবাগীশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উর্ধ্বতন নবমপুরুষ।

পরম্পরা

মহারাজ নরনারায়ণ ও বিশেষ করে শুক্লধ্বজের বীরত্বে কোচবিহার এক বিশাল রাজ্যে পরিণত হল। শুক্লধ্বজের অহংকার যে তাঁর শক্তিতে যখন এই বিশাল রাজ্য হলো তখন দাদা নরনারায়ণকে হত্যা করে তিনি নিজে রাজা হবেন—এই সংকল্প করে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে সিংহাসনারূঢ় মহারাজ নরনারায়ণের সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সেবাশুশ্রূষার পর জ্ঞানলাভ করে শুক্লধ্বজ মহারাজ নরনারায়ণকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন— "মহারাজ, আমি মহাপাপী। আমি এই তরোয়াল দিয়ে আপনাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসার সংকল্প করে এখানে এসেছি, কিন্তু এসে দেখলাম মা ভবানী-দেবীর কোলে আপনি বসে আছেন এবং ভবানী দেবী ত্রিশূল নিয়ে আপনাকে রক্ষা করছেন। ভবানীমায়ের তেজে ও রুদ্রমূর্তিতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। আমি কী অধম, ভবানী মায়ের বরপুত্রকে আমি হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি। এই তরোয়াল দিয়ে আপনি আমাকে এখনই হত্যা করুন।"

শুক্লধ্বজের কথা শুনে মহারাজ নরনারায়ণ বললেন,—"ভাই, তুমি ভাগ্যবান, আমি মা ভবানীর কোলে বসে থেকেও তাঁকে দেখতে পাইনি, আর তুমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছ, তুমি ধন্য, তুমিই রাজা হওয়ার যোগ্য।"

এরপর মহারাজ নরনারায়ণ তিন দিন প্রায়োপবেশনে কাটানোর পর মা ভবানী দেবীর দর্শন পান এবং মা বলেন—"শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমার সেবা পূজা করলে আমি তোমাদের সর্বদা রক্ষা করব।"

মায়ের কথাটি সত্যি, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও রাজবংশ ৪৫০ বৎসর রাজত্ব করেনি যা কোচবিহারের মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশধররা করে গেছেন। মহারাজ বিশ্বসিংকে শিবপুত্র বলা হয় এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশকে শিব বংশ বলা হয়।

হিন্দু সংস্কৃতির ছয়-সাতটি প্রতীক

ছয় লক্ষণ (সাহিত্য)

১। উপাদান ২। লক্ষণ ৩। গৌড়ী সারোপা ৪। শুদ্ধ সারোপা ৫। গৌড়ী সাধ্যবসনা ৬। শুদ্ধ সাধ্যবসনা

ষট্ কর্ম (গণিত)

১। যোগ ২। বিয়োগ ৩। গুণ ৪। ভাগ ৫। বর্গ ৬। বর্গমূল

ছয়টি 'তিল' তিথি

১। তিল স্নান ২। তিল উচাটন ৩। তিল হোম ৪। তিলোদক পান ৫। তিল ভোজন ৬। তিল দান

ষড়-দোষ

১। নিদ্রা ২। তন্দ্রা ৩। ভয় ৪। ক্রোধ ৫। আলস্য ৬। দীর্ঘসূত্রতা

ষট্ গুণ (রাজনীতি)

১। সন্ধি ২। বিগ্রহ ৩। আক্রমণ ৪। আসন ৫। দ্বৈধীভাব ৬। সমাশ্রয়

ষট্ সুখ

১। অর্থাগম ২। নীরোগ থাকা ৩। প্রিয়া (অনুকূল পত্নী) ৪। প্রিয়বাদিনী ভার্যা ৫। অনুগত পুত্র ৬। অর্থকরী বিদ্যা

ছয় গরুড় পুত্র

১। সুমুখ ২। সুনামা ৩। সুনেত্র ৪। সুবর্চা ৫। সুরুচ ৬। সুবল

ছয় রিপু

১। কাম ২। ক্রোধ ৩। লোভ ৪। মোহ ৫। মদ্ ৬। মাৎসর্য

ষট্ প্রজ্ঞ

১। ধর্মজ্ঞ ২। অর্থশাস্ত্রী ৩। কামশাস্ত্রজ্ঞ ৪। মোক্ষজ্ঞ ৫। লোকশাস্ত্রজ্ঞ ৬। তত্ত্ববেত্তা

সপ্তধাতু

১। সোনা ২। রূপা ৩। তামা ৪। পিতল ৫। লোহা ৬। দস্তা ৭। সীসা

শরীরের সাতটি ধাতব উপাদান

১। রক্ত ২। পিত্ত ৩। কফ ৪। মাংস ৫। অস্থি ৬। মজ্জা ৭। শুক্র

সপ্তধান্য

১। যব ২। গোধূম (গম) ৩। তিল ৪। কঙ্গু (কাঁকড়ি ধান) ৫। শ্যামাক (সাম্বা) ৬। চীনা (ঘাসের দানা) ৭। ধান

সপ্তমৃত্তিকা

১। ঘোড়াশালের মাটি ২। হাতীশালার মাটি ৩। বাবীর মাটি ৪। রথচক্র পৃষ্ঠ মাটি ৫। সংযোগস্থলের মাটি ৬। পুকুরের মাটি ৭। গোশালার মাটি

সপ্তসমুদ্র

১। লবণ ২। ইক্ষু ৩। সুরা ৪। সর্পিঃ ৫। দধি ৬। ক্ষীর ৭। শুদ্ধোদক

সপ্তদ্বীপ

১। জম্বু ২। প্লক্ষ ৩। কুশ ৪। ক্রৌঞ্চ ৫। শাক ৬। শাল্মলী ৭। পুষ্কর।

বোধকথা

রাজার নীতি রাজনীতি

একবার মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি কোনও বলবান শত্রু রাজা কোনও দুর্বল রাজার রাজত্ব আক্রমণ করে তখন কূটনৈতিক দৃষ্টিতে দুর্বল রাজার কি করা উচিৎ?"

ভীষ্ম পিতামহ একটু মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'একটা ছোট পৌরাণিক গল্প বলছি, শোন।' তারপর তিনি বলতে লাগলেন,—জলধিরাজ সমুদ্রের পত্নীরা হলেন বিভিন্ন নদী। সমুদ্র সব স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট কিন্তু বেত্রবতী নদীর উপর মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। একবার অসন্তুষ্ট সমুদ্রকে বেত্রবতী তার অপরাধের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে সমুদ্র বললেন, "তোমার তীরে অনেক ঝোপঝাড় রয়েছে, কিন্তু তুমি আমার কাছে তার কিছুই পাঠাও না। অন্যান্য নদী তো কতকিছু এনে আমার কাছে জমা করে। এমনকী একটা বেতগাছও দাওনি।' বেত্রবতী উত্তর দিলেন, 'স্বামী, এতে আমার কোনও অপরাধ নেই। কথা হলো—আমি যখন প্রবল বেগে বয়ে চলি তখন বেতের ঝাড়গুলো মাথা নীচু করে ফেলে। মাটির কাছাকাছি চলে যায়। আমার প্রবাহ বেগ কম হলেই আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। এজন্য আমি আপনাকে একটাও বেতগাছ দিতে পারি না।' এই গল্প বলার পর ভীষ্ম বললেন, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী দুর্বল রাজার বিনম্র হওয়া উচিৎ।'

আদর্শ ক্ষত্রিয়-মাতা কুন্তীদেবী

মহাভারতের কথা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ক্ষণে শর্তমতো দুর্যোধন যাতে পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করে সেজন্য অনেকেই রাজা দুর্যোধনকে বোঝাচ্ছিলেন। সকলে নিষ্ফল হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁর মুখের উপরই বলে দেন—সূচের ডগায় যেটুকু মাটি ধরে তাও তিনি বিনাযুদ্ধে দেবেন না। যথারীতি কৃষ্ণ নিরাশ হলেন। পঞ্চ পাণ্ডব তো বনবাসে। বিদুরের ঘরে ছিলেন মাতা কুন্তী।

কৃষ্ণের মুখে সব কথা শুনলেন মাতা কুন্তী। তিনি কিন্তু আদৌও নিরুৎসাহিত হলেন না। তিনি আদর্শ বীরমাতা এবং ক্ষত্রিয়ানীর মতোই বললেন—"কৃষ্ণ, তুমি গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে আমার কথা বলো। বলবে, ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর পরোয়া না করে অত্যাচারীর মূল উপড়ে ফেলতে হবে। রাষ্ট্রের ভিত্তিই হ'ল ধর্ম। সেই ধর্মরক্ষার জন্য মৃত্যুবরণ করতেও ভীম, অর্জুন যেন পিছপা না হয়। কোনও ক্ষত্রিয়ানী যদি সন্তান কামনা করে তা সে যেন ধর্ম ও কর্তব্য পালনের জন্যই করে। এবার সেইদিন সমাগত। কঠিন সময়ে বীরপুরুষেরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করে, দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় না।

বলবে বিদুলার পুত্র যখন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মায়ের কাছে এসেছিল তখন মা ছেলেকে পুনরায় যুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করেছিল। পুত্র যদি যুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হয় ক্ষত্রিয় মা তাতেই সন্তোষ পান। আমি চাই আমার ছেলেরা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করুক। তারা যেন কাপুরুষের মতো জীবনযাপন না করে।"

।। চিত্রকথা ।। শ্রীলঙ্কার উৎপত্তি ।। ২

গর্বোদ্ধত নাগরাজ আশপাশের পর্বতগুলোও পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

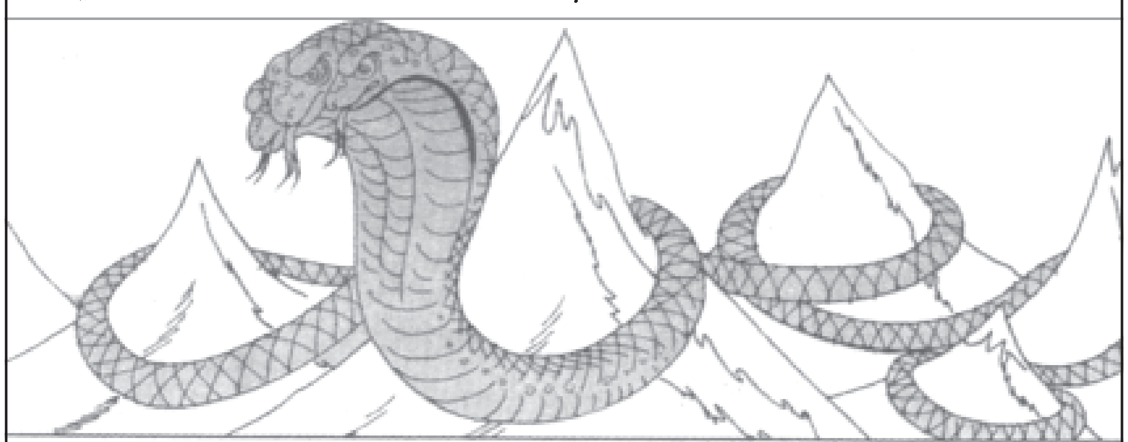

বায়ুর শক্তি ও ভয়াবহতায় সারা পৃথিবী থর থর করে কেঁপে উঠল। এমনকী দেবতারাও ভয়ে ভীত হলেন।

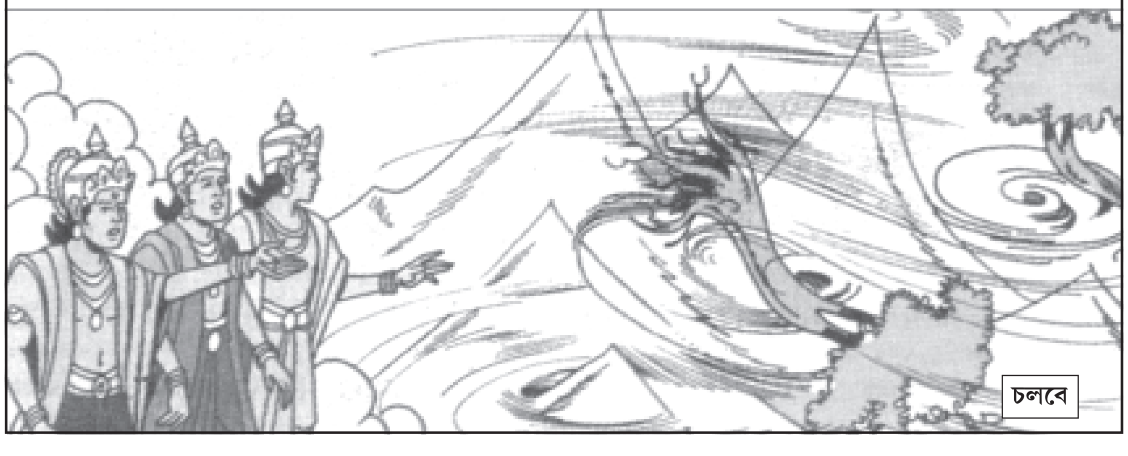

চলবে

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

ছাত্রজীবনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য না পেলেও

মহাত্মা গান্ধীর অসামান্য জীবন নিয়ে গবেষণা করে আমেদাবাদের রিজওয়ান কাদরি তুলে এনেছেন বহু চমকপ্রদ তথ্য। গান্ধীজি ছাত্রজীবনে কখনই উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাননি। রাজকোটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতেই তিনি অকৃতকার্য হন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস, ভূগোল ও ইংরেজিতে শূন্য পেয়েছিলেন। দু'বারে ম্যাট্রিক পাশ করেন;এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৩৯.০৬ শতাংশ। লণ্ডনে পড়তে গিয়ে ল্যাটিন ভাষায় ডাহা ফেল। ব্যারিস্টারি পাশ করলেও ইংরেজিতে কখনওই পোক্ত হতে পারেননি। কিন্তু এসব প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যর্থতা তাঁকে কাবু করতে পারেনি। বিস্তৃত কর্মজীবনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'মহাত্মা'।

অভিনব শিকার, বিচিত্র আপ্যায়ন

তিনি মাফিয়া ডন। নিবাস ইতালির নেপল্‌স, বড় বড় শিকার ধরেন। তবে শিকার ধরার কৌশল একটু অভিনব। যাকে টার্গেট করবেন, তাকে বাড়িতে ডেকে এনে আপ্যায়নের ফাঁকে এক সময় নিজের পোষা কুমিরটার সামনে হাজির করে এবং বলে, 'দাবী মতো টাকা দাও নইলে কুমিরটাকে লেলিয়ে দেব।' পৌনে দু'মিটার লম্বা কুমিরটাকে এই উদ্দেশ্যেই বাড়ির ছাদে সে পুষে রেখেছিল। পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিয়েছিল লুকোনো অস্ত্রের সন্ধানে। অস্ত্র উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁদের তো চক্ষু চড়কগাছ!

হাতির সার্ভিস-বুক, পেনশন...

সরকারি কর্মচারীদের মতো বনদপ্তরের কুনকি হাতিদেরও সার্ভিস-বুক আছে;তাতে লিপিবদ্ধ থাকে সমস্ত চাকরি জীবনের পুরস্কার ও তিরস্কারের কথা। সরকারি কর্মচারীর পূর্ণ মর্যাদাস্বরূপ তাদের দেওয়া হয় মাসিক মাইনে হিসেবে পেট ভরে খাওয়ার নিশ্চয়তা, রেশন, চিকিৎসা-ভাতা, অবসরের পর পেনশন। পরন্তু ওই সার্ভিস বুক-এ প্রতিটি হাতির জন্ম-বৃত্তান্ত, পিতা-মাতার পরিচিতি, শরীরের ওজন, উচ্চতা, শারীরিক গঠন আর গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করা থাকে চোখের। কারণ চোখই হলো বন পাহারা দেওয়ার ক্ষেত্রে হস্তী-শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি পালনের জন্যে মাসে গড়ে দশ থেকে এগারো হাজার টাকা খরচ হয়। বয়স বেড়ে গেলে মানবিক কারণে হাতিদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে লোকটা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এলে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম কী?'

—তা তো জানি না বাবু!

—চালাকি পেয়েছ, নিজের নাম জান না!

—তাই বলেন, আমি ভাবলাম কুকুরের নাম জিজ্ঞাসা করতিছেন।

* * *

প্রশ্ন ঃ মাথা মাটিতে রেখে পা-দুটো সোজা উপরে তুলে দিয়ে একটা ব্যায়াম আছে, বলতো ব্যায়ামটার নাম।

উত্তর ঃ শিরদাঁড়া ব্যায়াম।

* * *

ছাত্র ঃ আজ আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলাম স্যর, তাই স্কুলে আসতে আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেল।

শিক্ষক ঃ তোদের বাড়ি কত বড় যে পড়তে আধঘণ্টা সময় লাগে!

* * *

একটা লোকাল ট্রেন ছাড়ছে শিয়ালদা থেকে। একযাত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে জানলার ধারে-বসা যাত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি বনগাঁ?'

—না, শিয়ালদা।

* * *

—ওয়েটার, স্যুপের মধ্যে আরশোলা! এর মানে কী?

—স্যর, আমি একজন ওয়েটার, শিক্ষক নই যে আরশোলার মানে বলব।

—নীলাদ্রি

ম গ জ চ র্চা

১। মাথা আছে, লেজ আছে কিন্তু প্রাণী নয়। কী তবে?

২। সম্প্রতি কোন্ দেশ জলের তলায় পরিবেশ নিয়ে বৈঠক করে?

৩। ১৮৫০ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যৌথভাবে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কী নাম সেই পত্রিকার?

৪। ভারতীয় মহিলা অভিযাত্রী দলের কে প্রথম দক্ষিণ মেরুতে পা রাখেন?

৫। টেস্ট ক্রিকেটের দুনিয়ায় স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচটি কাদের সঙ্গে খেলেছিল?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। কয়েন

২। মালদ্বীপ

৩। সর্ব শুভকরী

৪। রিনা কৌশল ধর্মশক্তি

৫। ভারতের সঙ্গে

পরিচয়ের স্বতন্ত্রতা ও তাহার অনিবার্য ভয়াবহতা

অর্ণব নাগ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'। আর মনুষ্য সমাজে প্রচলিত ধারণা—তাহার নিজের মুখমণ্ডলই সর্বাপেক্ষা সুন্দর। অর্থাৎ কিনা আপন মুখের জয় সর্বত্র। কিন্তু এমন ভাবনার ক্ষেত্রে প্রথম ধাক্কাটি যা থেকে আসে তা হলো ভোটার পরিচয়পত্র বা ভোটার আইডি কার্ড। তথায় যে ছবিটি দৃশ্যমান হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই নিজের বলে ভাবতে খুবই কষ্ট হয়। সেই সঙ্গে ভোটার আই ডি-তে ছাপানো নিজের বা অভিভাবকের নামের বানানে অজস্র ভুল, এমনকী কোনও কোনও ক্ষেত্রে গোটা নামটির অভাবনীয় পরিবর্তন ভারতের ইলেকশান কমিশনের রাজত্বে একদমই অকল্পনীয় নয়। সুতরাং উক্ত ভ্রান্তিবিলাসখানা সদ্য কৈশোরে পা-রাখা কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যে অবিমিশ্র ক্রোধের উদ্রেক করে তা বলাই বাহুল্য। আর এই ভ্রান্তি নিরসনে স্বচ্ছল যুবক-যুবতীদের 'ভরসা থাকুক' হিসেবে আবির্ভূত হয় 'পাসপোর্ট' কিংবা 'ড্রাইভিং লাইসেন্স', নিদেনপক্ষে হালের ফ্যাশান 'প্যান কার্ড'। অপরদিকে তুলনামূলকভাবে অস্বচ্ছল যুবক-যুবতীদের আপন পরিচয়ের যাবতীয় মাধুরী সেই চিরাচরিত রেশন কার্ডের গন্ডীতেই আবদ্ধ থাকে।

এই গুরুতর 'পরিচয়-প্রশ্নের' লঘুতর সমাধান হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক ভাবনা—আসমুদ্রহিমাচল দেশবাসীকে এমন একটি স্বতন্ত্র পরিচয় পত্র দেওয়া হবে, যা ভবিষ্যতে তাহার একান্ত আপনার বলেই পরিগণিত হবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

২০০৮-এর নভেম্বরে ক্ষমতাসীন মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণ সম্মতিতে যে সংস্থাটি গঠিত হলো তার নাম ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব্ ইন্ডিয়া বা সংক্ষেপে ইউ আই এ ডি আই। সরকারি গুরুত্ব বোঝাতে একে অন্তর্ভুক্ত করা হলো যোজনা কমিশনের প্রকল্পের আওতায়। যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে এর আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবেও রাখা হলো। তার পরের বছরই এতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন—ইউ আই এ ডি আই-এর প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হলেন বিখ্যাত তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিসের সহযোগী চেয়ারম্যান নন্দন নিলেকানি। সংস্থাটির মূল লক্ষ্য ২০১১-১২-এর মধ্যে প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য একটি একক পরিচয়পত্র তৈরি করা যার বৈশিষ্ট্য হলো তাতে একটি স্বতন্ত্র নম্বর থাকবে যেটার মাধ্যমে একডাকে সর্বজনমধ্যে পরিচিত হবেন সংশ্লিষ্ট ভারতবাসী। সম্প্রতি এটাতে কয়েকটি জৈব-পরিসংখ্যানগত একক বৈশিষ্ট্য যোগ করার কথা বলেছেন নিলেকানি। যেমন, মুখমণ্ডল, আঙুলের ছাপ ও চোখের মণি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী। এতে মানুষ চেনা আরও সহজ হবে। আর যাঁর হাতে এই কার্ডটি পৌঁছবে, তাঁর 'আমিত্বে'র অহংকারও বেশ পরিস্ফূট হবে। সরকার মনে করছে এর ফলে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ও সামাজিক ন্যায় থেকে বঞ্চিত মানুষের হাতে এই ইউনিক আইডি কার্ড পৌঁছলে তাঁরা অনেকভাবে উপকৃত হবেন। এই কার্ডের আরও একটা বৈশিষ্ট্য—রেশন কার্ড বাদে যাবতীয় পরিচয়পত্র হস্তগত হয় বয়স ১৮ পেরোলে। নিলেকানির বক্তব্য, ১৮-এর কমবয়েসিরাও এই পরিচয়পত্রের মালিক হতে পারেন। যদিও এর ন্যূনতম বয়স কত হবে তা এখনও অস্পষ্ট।

২০০১-এর জনগণনা অনুসারে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ১০২ কোটি ৮৬ লক্ষ ১০ হাজার (অসংশোধিত)। এর মধ্যে মুসলমানদের জনসংখ্যা ১৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৮৮ হাজার। ১৯৯১-এর জনগণনা অনুযায়ী এই বৃদ্ধির হার ৩৬.০২ শতাংশ। সেক্ষেত্রে হিন্দু বৃদ্ধির হার দশ বছরে ২০.৩৫ শতাংশ (তথ্যসূত্র ঃ স্বস্তিকা, দীপাবলি সংখ্যা ২০০৪, পৃঃ ২৩)। শুধুমাত্র যথেচ্ছ সন্তান উৎপাদন করে জনসংখ্যার এহেন তারতম্য ঘটানো সম্ভব নয়। যদি না 'অনুপ্রবেশ' নামক একটি অবৈধ ও গর্হিত প্রক্রিয়ায় ওদিককার মানুষ বেড়াটা টপকে এদিকে চলে আসেন। অনুপ্রবেশ নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা 'স্বস্তিকা'র পাতায় হয়েছে। সেই চর্বিত চর্বনে না গিয়ে ওই আলোচনার সারাংশটুকু উদ্ধৃত করে বলা যায় সারা দেশে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। এবং দুর্ভাগ্যবশত সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য সরকারি হস্তে থাকলেও তাদের চিহ্নিতকরণের কাজটা সরকার এখনও অবধি করে উঠতে পারে নি। একথা অনস্বীকার্য যে উত্তর-পূর্ব ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া এলাকাতে সরকারি কৃপায় বিশাল সংখ্যক অনুপ্রবেশকারীদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে রেশন কার্ড ও ভোটার পরিচয়পত্র।

এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বলতেই হচ্ছে দিল্লী হাইকোর্ট বা গৌহাটি হাইকোর্ট অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়নের স্বপক্ষে একাধিক রায় দিলেও সরকার অনুপ্রবেশকারী মুক্ত রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জিকা (ন্যাশানাল রেজিস্টার অব্ সিটিজেনশিপ বা এন আর সি) আজও অবধি করে উঠতে পারেননি। সুতরাং অর্বাচীনের মতো ভোটার আই ডি বা রেশন কার্ডের ওপর ভিত্তি করে একক পরিচয়পত্র প্রদান করলে তাতে সন্দেহাতীতভাবেই অনুপ্রবেশকারীদের নাম চলে তো আসবেই, বরঞ্চ সরকারি ধৃষ্টতার নমুনা স্বরূপ কোনও প্রকৃত ভারতীয়-র নাম তা থেকে বাদ যাওয়াও বিচিত্র নয়। অনুমান করা যায় ভারতের জনসংখা ১২০ কোটি ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে কোটি তিনেক অনুপ্রবেশকারীকে এদেশ থেকে ঘাড়ধাক্কা দেওয়াটা এমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়। ১৯৫১ সালের জনগণনার তালিকা বা ১৯৫৫-এর 'সিটিজেন্স অ্যাক্টে'র সঠিক প্রণয়ন একাজের সহায়ক হতেই পারে। প্রশ্নটা আসলে সদিচ্ছার। যে জিনিসটা সরকারের একেবারেই নেই। নইলে যে আর্থিক অনগ্রসরতা ও সামাজিক ন্যায়ের কথা বলা হচ্ছে তাতে হয়তো সর্বাগ্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার ওপার থেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়ে আসা হিন্দুদের।

প্রেক্ষিতে যখন ইউ আই ডি

নিলেকানি

নেহরু-লিয়াকত চুক্তিকে অগস্ত্য যাত্রায় পাঠিয়ে '২০০৩-সিটিজেন্স অ্যাক্টে'র মাধ্যমে ১৯৭১-এর পরে এদেশে আসা যাবতীয় হিন্দুর ভারতে বাস করার মৌলিক অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের রক্ত ঝরানোর প্রতিদান যে বাংলাদেশ অনুপ্রবেশ আর হিন্দু-নিধনের মধ্যে দিয়ে ভালোই দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে তার একটি অকাট্য প্রমাণ এখানে হাজির করা হলো। ১৯৯১ থেকে ২০০১—এই দশ বছরে বিগত অর্ধশতকের প্রতি দশ বছরের তুলনায় বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ সবচেয়ে কম, ১৬.৪৯ শতাংশ। এই পরিমাণই সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯৬১ থেকে ১৯৭৪-এর মধ্যে, ৪০.৫৯ শতাংশ। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ অবধি যা দাঁড়ায় ২১.৮৮ শতাংশ-এ। লক্ষণীয়ভাবে '৭৪ থেকে '৮১ পর্যন্ত এই সাত বছরে হিন্দু বৃদ্ধির পরিমাণ ৯.২৭ শতাংশ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এখনও অবধি সর্বকালীন রেকর্ড (তথ্যসূত্র ঃ এনডেনজার্ড ডেমোগ্র্যাফী বাই বিমল প্রামাণিক, পৃঃ ১৩১)। বোঝাই যায়, মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অনুপ্রবেশ-এর চক্রান্ত রচিত হয়েছিল। যে কারণে '৬১-'৭৪ আর '৭৪-'৮১, এই দুই জনগণনার ব্যবধানে মোট জনসংখ্যার শতাংশের এত তারতম্য হয়। আর পায়ের তলায় মাটি পাওয়া হিন্দুর সংখ্যাও যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল সেই সময় তা উপরোক্ত পরিসংখ্যানেই প্রতিফলিত। কিন্তু পরের দিকে বিশেষ করে বেগম জিয়া ক্ষমতাসীন হবার পর বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের ফলে তারা এখানে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলো।

প্রশ্নটা হচ্ছে, এদেশের প্রত্যেককে যখন ইউনিক আই ডি দেওয়া হবে, সেটা অনুপ্রবেশকারীদের ভাগ্যে জুটলেও উদ্বাস্তুদের মোটেই জুটবে না। তবে কি নিরুপায়, নিরাশ্রয় উদ্বাস্তুরা এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক কিংবা অ-নাগরিক হিসেবেই গণ্য হবেন নাকি ফেরত পাঠিয়ে বাংলাদেশের হিংস্র শ্বাপদের মুখে তাঁদের ছেড়ে দেবেন আমাদের দেশের সরকার বাহাদুর?

ইউ আই ডি-র স্বপক্ষে একটা বড় যুক্তি হলো আমেরিকায় যে সামাজিক নিরাপত্তা নম্বরের বন্দোবস্ত চালু রয়েছে, এখানকার স্বতন্ত্র নম্বরটি নাকি তারই জুড়িদার হবে। '২০০৩ সিটিজেন্সশিপ অ্যাক্টে'র দরুণ উদ্বাস্তুদের জন্য সেই ইউনিক আই ডি-র ব্যবস্থা যখন নাই করা গেল তখন সামাজিক নিরাপত্তার বাণীর নীরবে নিভৃতে কাঁদা ব্যতীত আর কিছুমাত্র হওয়া সম্ভব নয়।

সবচেয়ে বড় কথা, ইউ আই ডি এ আই-এর লক্ষ্য ২০১৪-এর মধ্যে ৬০ কোটি মানুষের হাতে এই একক পরিচয়পত্র পৌঁছে দেওয়া। এবং গ্রাহকদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে তাদের কাজের সুবিধের জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানীগুলো ও টেলিকম কোম্পানীসমূহ এই ইউনিক আই ডি একান্তভাবেই চাইছে। তথ্যপ্রযুক্তির একটু গোলমালে যে ওই সমস্ত আর্থিক সংস্থাগুলিতে যৌথভাবে অংশীদারিত্ব রাখা বহুগ্রাহকের কাছে একাধিক 'স্বতন্ত্র সংখ্যা' হিসেবে ইউ আই ডি পৌঁছে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওই সংস্থাগুলির বা ধরেই নেওয়া যেতে পারে 'আরবান' এলাকার ৬০ কোটি মানুষদের হাতেই ইউ আই ডি আগে পৌঁছোবে। কিন্তু আর্থিক ভাবে অনগ্রসর বাকি ৬০ কোটির কাছে এটা আরও আগে পৌঁছনো অনেক বেশি জরুরী।

একক পরিচয়পত্রের এই বিরাট কর্মকাণ্ডে সব মিলিয়ে খরচ হবে প্রায় দেড়শ' কোটি টাকা। যতই হোক ইউ আই ডি জিনিসটাকে খুব একটা মন্দ বলা যাবে না। বিশেষ করে মাল্টি পারপাস ন্যাশানাল কার্ড হিসেবে এটা ব্যবহৃত হতেই পারে। কিন্তু তার জন্যে গড়ে তোলা দরকার সিটিজেন্সশিপ রেগুলেটরি অথরিটি অব্ ইন্ডিয়ার মতো একটি স্বশাসিত সংস্থা। যাদের এক এবং একমাত্র কাজ হবে অনুপ্রবেশকারীদের প্রথমে চিহ্নিতকরণ, তারপর ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়া ও সবশেষে এদেশ থেকে তাড়ানো। এই জিনিসটা সম্ভব হলে তখনই মাল্টি পারপাস ন্যাশানাল আইডেন্টি কার্ডে একটি একক নাগরিক চিহ্নিতকরণ নম্বর (ইউনিক সিটিজেন আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার) দেওয়া যথাযথ হবে। নইলে বর্তমানে যে একক পরিচয়পত্রের কথা বলা হচ্ছে তা কেবল নিস্ফলাই নয়, আগামীদিনে দেশজুড়ে সামাজিক তো বটেই, সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করবে।

> **অর্বাচীনের মতো ভোটার আই ডি বা রেশন কার্ডের ওপর ভিত্তি করে একক পরিচয়পত্র প্রদান করলে তাতে সন্দেহাতীতভাবেই অনুপ্রবেশকারীদের নাম চলে তো আসবেই, বরঞ্চ সরকারি ধৃষ্টতার নমুনা স্বরূপ কোনও প্রকৃত ভারতীয়-র নাম তা থেকে বাদ যাওয়াও বিচিত্র নয়।**

মুসলিম সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দেশে ও রাজ্যে মুসলিম সংরক্ষণের যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তার তীব্র বিরোধিতা করে গণ আন্দোলনে নামছে 'অল ইন্ডিয়া লিগাল এইড ফোরাম'। ফোরামের সম্পাদক জয়দীপ মুখার্জী এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন—দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মের ভিত্তিতে কেন সংরক্ষণ? তাহলে কি আর একটি পাকিস্তান তৈরি করার পরিকল্পনা শুরু করা হয়েছে? আবার হাজার হাজার হিন্দুদের উদ্বাস্তু করার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে? তাই এই মুসলিম সংরক্ষণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সমস্ত হিন্দুদের নিয়ে গণআন্দোলনে নামছে 'অল ইন্ডিয়া লিগাল এইড ফোরাম'। ১৯৯১ সালের মণ্ডল কমিশনের বিরুদ্ধে গঠিত আন্দোলনের চাইতেও আরও মারাত্মক আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। দেশ ও রাজ্যের সমস্ত গোষ্ঠীর হিন্দু সম্প্রদায়কে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। বাংলার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, সাঁওতাল এবং সমস্ত স্তরের/গোষ্ঠীর মানুষদের নিয়ে কলকাতার শহীদ মিনারে সমাবেশ করে সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করা হবে। মুসলিম সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য গঠিত হচ্ছে মুসলিম সংরক্ষণ বিরোধী জাতীয় মঞ্চ। ধর্মতলায় সমাবেশের মধ্যে দিয়েই এই মঞ্চ তার কর্মসূচী আরম্ভ করবে।

জনপ্রিয় নাটকের চলচ্চিত্ররূপ

থানা থেকে আসছি

বিকাশ ভট্টাচার্য।। মঞ্চ সফল নাটক নিয়ে অনেক সিনেমা হয়েছে। তার সবই যে সিনেমাপ্রেমীদের সমানভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছে, এমন নয়। ১৯৬৪-তে নবনাট্য আন্দোলনের সময় গ্রুপ থিয়েটারের মঞ্চে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটক 'থানা থেকে আসছি' বেশ আলোড়ন তুলেছিল। নাটকটির জনপ্রিয়তা দেখে তখনকার সফল চলচ্চিত্রকার হীরেন নাগমশায় উত্তমকুমার, মাধবী চক্রবর্তী ও কমল মিত্র প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে ছবি করেছিলেন। সাদা কালোয় তোলা সেই ছবি এখনও টি.ভি-র বিভিন্ন চ্যানেলে দেখা যায়। ১৯৮৩-তে এই 'থানা থেকে আসছি'-তে মঞ্চ াভিনয় করার সময়ই নবমীর এক রাতে অভিনয় সেরে ফিরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন অভিনেতা-নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কি আছে এই নাটকে যা ৫০ বছর ধরে নাট্যকর্মী, চলচ্চিত্রকর্মী সকলকে আকৃষ্ট করে চলেছে? আজকের প্রজন্মের চলচ্চিত্রকার সারণ দত্ত বিষয়বস্তুর অমোঘ টানেই দর্শকদের আকৃষ্ট করেছেন। প্রথমেই বলা যাক ছবির সেই কাহিনি। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'থানা থেকে আসছি' ছবির যা অমোঘ টান। যেদিন কলকাতার ঝাঁ চকচকে একটা বাড়িতে অসীম প্রতিপত্তিশালী অমরনাথ মল্লিকের একমাত্র মেয়ে রিনিতার সাথে ধনী যুবক রজতের এনগেজমেন্ট হচ্ছিল সে দিনই মেছোবাগান বস্তিতে নিজের জীবনের জ্বলে থাকা শেষ আলোটুকু নিভিয়ে দিয়েছিল এক যুবতী—সন্ধ্যা মণ্ডল।

'থানা থেকে আসছি' ছবিতে রুদ্রনীল-পাওলি

আমোদপ্রমোদের শেষে সব অতিথিরা যখন চলে গেছেন, তখন অমরনাথ, তার স্ত্রী সুতপা, মেয়ে রিনিতা, ভাবী জামাই রজত আর পুত্র অরীন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। ঠিক এরকম সময় হঠাৎ মল্লিক বাড়ির দরজা ধাক্কার শব্দে সবাই চমকে ওঠে। অবাক হয়ে দেখে পদ্মপুকুর থানার সাব ইন্সপেক্টর তিনকড়ি হালদার
এসেছেন সন্ধ্যা মণ্ডলের মৃত্যুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সন্ধ্যার ঘরে পাওয়া ডায়েরীতে মল্লিক বাড়ির সকলের নাম উল্লেখ আছে যে। একটা বস্তির মেয়ের মৃত্যুর সাথে কি ভাবে জড়িয়ে যেতে পারে তাদের নাম? তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। অথচ একটা ফটোগ্রাফ দেখামাত্র তারা সকলেই ফিরে যেতে শুরু করে তাদের অতীত জীবনের পাতায়। যেখানে কোথাও সন্ধ্যা রেবা নামে এক অফিস কর্মী, কোথাও স্বপ্না নামে এক পারসোনাল সেক্রেটারী, কোথাও সোনালী নামের এক মেয়ে, যে একটা মানুষ পেতে চায় নিজের করে...যাকে বিশ্বাস করে ভালবাসা যায়। কিন্তু অভাগী মেয়েটি প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতারিত।

'থানা থেকে আসছি' ছবিতে পাওলি দাম

ন্যায়-অন্যায়ের ঘাত প্রতিঘাতে মুহূর্তের মধ্যে মল্লিক বাড়িতে সকলের বিরুদ্ধে সকলে অভিযোগের আঙ্গুল তোলে। কিছুক্ষণ আগের আনন্দসন্ধ্যার সব মজাটুকুই হারিয়ে যায় একটামাত্র ঘটনার অভিঘাতে। কিন্তু কে এই তিনকড়ি...কি চায় সে? কখনও হয়ত চোখে যা দেখে তার থেকে বেশী কিছু ঘটতে থাকে অথবা মনের একটা ছোট অংশ বিচারক হয়ে বসে বাকি মনটাকে বিচার করার জন্য।

চিত্রনাট্যকার ও নির্দেশক সারণ দত্তকে ধন্যবাদ, তিনি বহুচর্চিত এই নাটককে সম্পূর্ণ বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে—আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে, আজকের মানসিকতায় চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। বলা যায় একটি স্মার্ট প্রোডাকশন। অভিনয়ে প্রথমেই সন্ধ্যা মণ্ডলের ভূমিকাভিনেত্রী পাওলি দামের নাম করতে হয়। পুরো ছবিটাতে মাত্র তিন-চারটি সংলাপ আছে তার। প্রায় নির্বাক অভিনয়ে শুধু বাঙ্ময় দুটি চোখ কথা বলে গেছে। সংযত অভিনয় করেছেন পরমব্রত এবং অমরনাথের ভূমিকায় দুলাল লাহিড়ি। এক বখে যাওয়া ধনী যুবকের ভূমিকায় রুদ্রনীল ঘোষের অভিনয় উল্লেখ করার মতো। সৌমিক হালদারের ফটোগ্রাফী ঝাঁ চকচকে। অপূর্ব ছবির সম্পাদনা। সঞ্জীব দত্ত এজন্য বাহবা পাবেন। কমার্শিয়াল বাংলা ছবির
হিট মিউজিক ডিরেক্টার জিত গাঙ্গুলী এ ছবিতে মিসফিট। সব মিলিয়ে এখনকার হিন্দী-তামিল-তেলেগু ছবি রিমেকের যুগে নাটক নিয়ে বাংলা ছবির এই এক্সপেরিমেন্ট এক কথায় সফল। ধন্যবাদ পরিচালক সারণ দত্ত।

শব্দরূপ - ৫৩৫

শ্রেষ্ঠা সমাদ্দার

■	■	১			২	■	৩
৪	৫		■	■		■	
■		■	■	■	৬	৭	
৮				■	■		■
■		■	■	৯			
১০		১১	■	■	■		■
	■		■	■	১২		
	■	১৩				■	■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. বিষ্ণু ও শিবের অভেদ মূর্তি, ৪. ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সংস্কার থেকে মুক্ত সাধক সম্প্রদায় বিশেষ, ৬. ডাক নামে লখিন্দর, ৮. বাল্যনামে শ্রীকৃষ্ণ, প্রথম দুয়ে মাখন, ৯. বিশেষণে স্ত্রী অর্থে প্রাণসঞ্চ ারকারিণী, জীবনদায়িনী, ১০. কন্দর্প, কামদেব, ১২. বাসভবনের অংশ, আগাগোড়া পায়ের অলংকার, ১৩. প্রণাম।

উপর-নীচ ঃ ১. লাঙল, ২. ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর, ৩. দেশিশব্দে বাঁশের পাতলা চোকলা ইত্যাদির তৈরি আসনবিশেষ, ৫. বেদান্ত, বেদের জ্ঞানকাণ্ড, ব্রহ্মবিদ্যা, দুয়ে-পাঁচে চরণ, ৭. কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় অগ্নির দ্বারা মহাভারতের এই অরণ্য দগ্ধ হয়েছিল, চতুর্থ ঘরে কাটারি, ১০. দেবালয়, উপাসনা-গৃহ, ১১. এই কানন স্বর্গের উদ্যান, ১২. নশ্বর।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৩৩

রা	খা	ল	রা	জ	■	■	প্র
■	লি	■	■	ঙ্গ	■	■	হ্ল
■	জু	■	■	ম	স	ন	দ
ল	লি	তা	■	■	লি	■	■
■	■	ড়	■	■	ল	তি	কা
ম	হা	কা	ল	■	■	লো	■
স্থ	■	■	ক্ত	■	■	ত্ত	■
রা	■	■	ক	স্কা	ল	মা	লী

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া-৩

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৩৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ সংখ্যায়

শতবর্ষ পেরিয়ে

আন্তর্জাতিক সম্মানে সম্মানিত দেবকী কুমার বসু

বিকাশ ভট্টাচার্য।। গত ২৫ নভেম্বর ২০০৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার দেবকী কুমার বসুর জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সমিতি ছায়াছবি প্রদর্শন ছাড়াও তাঁর পরিচালিত বিভিন্ন ছায়াছবির স্টিল ফটোর এক প্রদর্শনের আয়োজন করে নন্দন-এ। দেবকী কুমার বসু বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ে ১৮৯৮ সালের ২৫ নভেম্বর জন্মগ্রহ করেন। পিতার নাম মধুসূদন বসু। শৈশব কেটেছে ওই জেলারই রাঢ় মাটিতে। ১৯২৯ সাল নাগাদ বাংলা ছায়াছবির প্রবাদপুরুষ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি)-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ডি জি-র প্রযোজনায় দেবকী কুমার বসুর চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় তৈরি হল 'পঞ্চ শর'। এরপর তিনি নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন এবং তাঁর নির্দেশনায় 'চণ্ডীদাস' (১৯৩২) দর্শক সমাজে আলোড়ন তুলল। 'অপরাধী' ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক হিসেবে কাজ করায় বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন তিনি। ১৯৩৫-এ যোগ দেন ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানিতে। হিন্দী ও বাংলা ডবল ভার্সানে তৈরি করলেন 'সোনার সংসার'। তাঁর নির্দেশিত হিন্দীতে 'সীতা' প্রথম ভারতীয় সিনেমা, যা ১৯৩৫ সালে ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'সার্টিফিকেট অফ মেরিট' পেয়েছিল। ১৯৩৯-এ নির্মিত কানন দেবী ও পাহাড়ি সান্যাল অভিনীত 'সাপুড়ে' দেবকী কুমার বসুর আরও একটি সুপার হিট ছবি। এছাড়াও কমল দাশগুপ্ত সুরারোপিত অশোক কুমার অভিনীত বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে "চন্দ্রশেখর", (১৯৪৭) অনিল বাগচি সুরারোপিত রবীন মজুমদারের মর্মস্পর্শী অভিনয় সমৃদ্ধ তারাশংকরের 'কবি' (১৯৪৯), রবীন্দ্রনাথের নাটক অবলম্বনে অহীন্দ্র চৌধুরী এবং জহর গাঙ্গুলী অভিনীত 'চিরকুমার সভা' (১৯৫৬) তাঁর অসংখ্য জনপ্রিয় ছবির মধ্যে কয়েকটি। ১৯৬১-তে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় তিনি নির্মাণ করলেন 'অর্ঘ্য'। এই অর্ঘ্যই তাঁর নির্দেশিত শেষ ছবি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অর্ঘ্য ছায়াছবিটি রবীন্দ্রনাথের চারটি কবিতা নিয়ে নির্মিত। ১৯৫৬ সালে তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য 'আকাদেমি' সম্মান এবং ১৯৬৫-তে পদ্মশ্রী।

বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে ভূষিত আশিস গৌতম

আপনত্ব জাগলেই সেবা সম্ভব শ্রীসুদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "আপনার করে ভাবার কারণেই অন্যের সেবা করা যায়। শিশুর কান্না দেখেই মা বুঝে যান ছেলের কী চাই বা কী হয়েছে। আপনত্বের ভাব জাগলেই মাঝের পর্দা বা অন্ধকার দূর হয়। এমনিতে মানুষ তো পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে এই পরমাত্মার অবস্থানই হলো সাযুজ্য বা সমানতা। আর এই বিচারদর্শন কেবলমাত্র ভারতবর্ষে রয়েছে হিন্দু তত্ত্বজ্ঞানের কারণে।

বাইবেল ভিত্তিক পশ্চিমী চিন্তাধারা অনুসারে 'গড' মানুষকে, পৃথিবীকে ভোগের জন্য পাঠিয়েছেন। ফলে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার মূল কথাই হলো—অস্তিত্বের জন্য সংঘর্ষ, বলবানেরই বাঁচার অধিকার, প্রকৃতির শোষণ এবং ব্যক্তিগত অধিকার। এরকম সিদ্ধান্তের কারণ হলো পশ্চিমী দর্শন যেখানে—মানুষের শরীর, মন ও বুদ্ধির পরেও যা কিছু রয়েছে তার সম্পর্কে অজ্ঞানতা। হিন্দু তথা ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানে শরীর মন ও বুদ্ধির পর চতুর্থটি হলো আত্মা বা পরমাত্মা। গীতায় যাকে—'যো বুদ্ধে পরতস্তু সঃ'—বলা হয়েছে।" গত ২৪ জানুয়ারি সকালে কলকাতার প্রসিদ্ধ সংস্থা বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'বিবেকানন্দ সেবা পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রথম বক্তা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন তাঁর ভাষণে এই কথাগুলি বলেন। মানুষ স্বীয় প্রজ্ঞা এবং চেষ্টায় এই আপনত্ব অনুভবের পরিধি পরিবার, পাড়া, গ্রাম থেকে দেশ, বিদেশ, প্রকৃতি এবং পরমাত্মা বা পরমেষ্ঠি পর্যন্ত বিস্তার করতে পারেন বলে শ্রী সুদর্শনজী মন্তব্য করেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী রামতীর্থের জীবনের উদাহরণ দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সামনে ঘাসের উপর গোরুর পায়ের ক্ষুরের চাপ পড়াতে কষ্টে চীৎকার করে উঠেছিলেন। এবং তাঁর বুকে সেই গো-ক্ষুরের ছাপ দেখা গিয়েছিল। আর স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় যেইমাত্র—আমার 'আমেরিকাবাসী ভাই ও বোনেরা' বলে সম্বোধন করেছিলেন তখন পাশ্চাত্যবাসীরা নতুন কথা শুনেছিলেন। স্বামী রামতীর্থ তো নিজেকে সম্পূর্ণ ভারতের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"আমি কথা বললে ভারতের শাশ্বত বাণী মুখ থেকে বের হয়। আমিই হলাম ভারত।"

শ্রীসুদর্শন আরও বলেন, পাশ্চাত্য দর্শন তৈরি করেছে হিটলার, স্ট্যালিন, মাও-এর মতো ব্যক্তিদের। আর ভারতীয় দর্শন নরকে নারায়ণে উত্তরণ ঘটিয়েছে। আজকের সম্মান প্রাপক আশিস গৌতম হরিদ্বারে ঝুপড়িতে থেকে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করে চলেছেন। তিনি নরোত্তম। এধরনের কাজ ও চিন্তা ভাবনা হিন্দু তত্ত্বজ্ঞানেই সম্ভব।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন দিল্লী থেকে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী হিন্দী সাপ্তাহিক 'পাঞ্চ জন্য' পত্রিকার সম্পাদক বলদেব ভাই শর্মা। শ্রীশর্মা বলেন, সেবা করার জন্যও সৌভাগ্য প্রয়োজন। কেননা সত্যিকারের সেবার দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। মনের বিস্তার হলেই সেবার মনোভাব জন্মায়। ব্যষ্টি, সমষ্টি, সৃষ্টি এবং পরমেষ্টির মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের কথা কেবলমাত্র হিন্দু চিন্তাধারার মধ্যেই রয়েছে। শর্মাজী সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণের তীব্র সমালোচনা করেন। নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত সেবা হিন্দু চিন্তনেই নিহিত রয়েছে এবং এদেশের মানুষই একথা বলেছেন, অনুসরণ করেছেন। প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া সেবা হয় না। শ্রীশর্মা মধ্যপ্রদেশের রতলামে এক ধনী ব্যবসায়ীর পিপাসার্ত ট্রেন-যাত্রীদের স্বহস্তে জল পান করানোর ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি আশিস গৌতমের 'দিব্য-প্রেম সেবা মিশন'কে এক অনুকরণীয় উদাহরণ বলে অভিহিত করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী যুগলকিশোর জৈথেলিয়া বলেন, কুমারসভা পুস্তকালয় যে সকল মানুষ সবার অলক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম ও সেবার কাজ করে চলেছেন তাদেরকে সম্মান জানাতে চায়। এটি ২৩তম অনুষ্ঠান। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের একশ পঁচিশ বছর (জন্মজয়ন্তী) থেকে এই সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান শুরু করেছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রীসুদর্শনজী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন এবং ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। মঞ্চ স্থ সকলেই পুষ্পার্ঘ্য দেন। শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস আশিস গৌতমকে কপালে ফোঁটা দিয়ে বরণ করেন। বলদেবজী শর্মা শ্রীফল এবং যুগলজী শাল দিয়ে সম্মান জানান। সাম্মানিক ফলক ও ৫১ হাজার টাকার চেক শ্রীগৌতমের হাতে তুলে দেন শ্রীসুদর্শনজী। পুস্তকালয়ের পক্ষে সভা পরিচালনা করেন মহাবীর বাজাজ এবং ডঃ প্রেমশংকর ত্রিপাঠী। শ্রীত্রিপাঠী পুস্তকালয়ের সভাপতি। শেষে ধন্যবাদ জানান শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস। উপস্থিত ছিলেন অরুণ মল্লাবত, বিমল লাট এবং সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য শ্রীকান্ত যোশী।

বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে চারদিন ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৮তম জন্মজয়ন্তী কার্যক্রমের সমাপ্তি হয় গত ১৭ জানুয়ারি। সঙ্গের ছবিতে বক্তব্য রাখছেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও বিশিষ্ট শিল্পপতি এস কে রায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী অনিরুদ্ধানন্দ (সঞ্জীব মহারাজ) এবং সভাপতিত্ব করেন তুষারকান্তি মজুমদার।

লোডশেডিং-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিদ্যার্থী পরিষদ

সংবাদদাতা।। কোচবিহার জেলার কামাখ্যাগুড়িতে লাগাতার লোডশেডিং-এর প্রতিবাদে গত ২৭ জানুয়ারি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা কামাখ্যাগুড়ি-তুফানগঞ্জ ও কামাখ্যাগুড়ি-বারোবিশা রোডে পথ অবরোধ করে। পরে পরিষদের কামাখ্যাগুড়ি কলেজ শাখার প(থেকে স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বি(ােভ প্রদর্শনও করা হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বিদ্যার্থী পরিষদের জেলা সংযোজক বিপ-ব সরকার, কামাখ্যাগুড়ি কলেজ শাখার সম্পাদক সুব্রত সরকার, অশোক চৌহান প্রমুখ।

ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করছেন রাজ্যপাল দেবানন্দ কুঁয়ার। ছবিতে রয়েছেন গ্রন্থ সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য করুণাসিন্ধু দাস, ভিক্ষু বোধিপাল।

Swastika
8 February - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

সদ্‌ভাবনা সম্মেলনে সন্ত সমাবেশ

কেশব ভবনে সন্তদের সঙ্গে সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

বিবেকানন্দ সেবা সম্মান ঃ আশিস গৌতমকে চেক ও মানপত্র দিচ্ছেন শ্রীসুদর্শনজী।

কলকাতায় বাগবাজার থেকে গড়িয়ার পথে বিধান সরণিতে মহাসংকীর্তন যাত্রা।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৪ জানুয়ারি বিকেল। স্থান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় কার্যালয় কলকাতার কেশব ভবন। বাংলার প্রমুখ সন্ত-ধর্মাচার্যদের গলায় মালা দিয়ে প্রণাম নিবেদন করে বরণ করে নিচ্ছেন সঙ্ঘের ষষ্ঠ সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। এক বিরল দৃশ্য। সামনের দিকে চেয়ারে বসে রয়েছেন—নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শনজী, বরিষ্ঠ সন্ত এবং পরমার্থ সাধক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণুপুরীজী মহারাজ, রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, মহানাম মঠ সম্প্রদায়ের শ্রীমদ্ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী।

অনুষ্ঠানের সূচনাতে মোহনজী বললেন, সদ্‌ভাবনা ছাড়া কোনও কাজ হতে পারে না। ভারতের বাইরের অনেকেই চান না এদেশে বিভিন্ন মঠ-পন্থ-সন্ত সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সদ্‌ভাবনা হোক। তাদের চেষ্টাই থাকে এদেশের বিবিধতাকে বিরোধে রূপান্তরিত করতে। উদাহরণ হিসেবে শ্রীভাগবত বললেন, মহারাষ্ট্রে একদল লোক শিবাজীর নামে হিন্দুত্বের বদলে শিবধর্ম বলে প্রচার করেন। সরসঙ্ঘচালকজী আরও বলেন, সদ্‌ভাবনা ছাড়া সমতা হয় না, শুধু আইন করে সমতা হয় না। আইন তো কৃত্রিম। মনে ভাবনা চাই। এদেশের অনেক মহাপুরুষেরা একাজ করেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ১৯২৫ থেকে একাজ করে চলেছে। তদানীন্তন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর উদ্যোগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্থাপিত হয়েছে। ১৯৭২-এ উড়ুপীতে অনুষ্ঠিত ধর্মাচার্য সম্মেলনে সকল প্রমুখ সন্তরা একযোগে প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন—''হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতার কোনও স্থান নেই—''হিন্দবঃ সোদরাঃ সর্বে, ন হিন্দু পতিতো ভবেৎ।''

এরপর অনেক ধর্মাচার্যরা নিজেদের বক্তব্য রাখেন। প্রবীণ সন্ত স্বামী বিষ্ণুপুরী মহারাজ বলেন, ছোটবেলা থেকেই সংস্কার দেওয়ার জন্য আর এস এস-এর শাখা চালাতে সবরকম সাহায্য করতে হবে। আর জোরের সঙ্গে সর্বত্র হিন্দুত্বের কথা বলতে হবে—আশ্রমে এবং বাইরেও। তিনি ঘোষণা করে জানিয়ে দেন তাঁর কলকাতার আশ্রমে গত ১৫ বছর যাবৎ সঙ্ঘের শাখা চলছে।

আদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরালভাই সন্তদের পক্ষ থেকে সরসঙ্ঘচালকজীকে এক বিরাট মালা দিয়ে 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' বলে আখ্যায়িত করেন। উপস্থিত সন্তমণ্ডলীর আগ্রহে এবং অনুরোধে মোহনজীকে গলায় মালা গ্রহণ করতেই হয়। তবে উনি সেই মালা তক্ষুনি সামনে ভারতমাতার মূর্তিতে নিবেদন করেন।

মুরালভাই বলেন, তাঁর আশ্রমে নিয়মিত ভাবে মাঝে মাঝেই সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যক্রম হয়ে থাকে।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী যুক্তানন্দ। বর্ধমান থেকে আগত স্বামী তেজসানন্দ গিরি, স্বামী জ্যোতির্জয়ানন্দ এবং বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী। স্বামী দেবানন্দজী বর্তমান ও প্রাক্তন দুইজন সর-সঙ্ঘচালকজীকে শাল দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন উপস্থিত সন্তদের পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য মঠ-পন্থের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব ছিল—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, পরমার্থ সাধক সঙ্ঘ, সীতারামদাস ওঁকারনাথ প্রতিষ্ঠিত মহামিলন মঠ, আনন্দমার্গ সাধক সঙ্ঘ, বাহিরখণ্ড বৈদিক আশ্রম, রিষড়া প্রেমমন্দির, শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, মহানাম মঠ, উত্তম আশ্রম, আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠ, আর্য সমাজ, গায়ত্রী পরিবার, সন্ত রবিশংকরজীর আর্ট অফ্ লিভিং, পতঞ্জলি যোগপীঠ, শিখ সমাজ, জৈন সমাজ এবং নিগমানন্দ মঠ (হালিশহর) প্রভৃতি।

সন্তকে মালা দিয়ে প্রণাম জানাচ্ছেন সরসঙ্ঘচালক।

সদ্‌ভাবনা সম্মেলনে ৩৮টি মত-পথ ও পন্থ সম্প্রদায়ের ৪৭ জন ধর্মাচার্য উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া ছিলেন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস সহ সঙ্ঘের প্রাদেশিক ও ক্ষেত্রীয় কার্যকর্তারা।

সবচেয়ে আনন্দ-আবেগময় দৃশ্য ছিল —যখন কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সন্ত যাঁরা আগে নিয়মিত স্বয়ংসেবক ও প্রচারক ছিলেন তাঁদেরকে সরসঙ্ঘচালকজী মাল্যার্পণ করে প্রণাম নিবেদন করতে যান। সে এক অদ্ভুত ও আনন্দদায়ক। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রমুখ সন্তসমাজ হিন্দু সংগঠনে সামিল।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com